পরিবর্তন

২৬ জানুয়ারি ১৯৮৩

প্রজাতন্ত্র দিবস সংখ্যা

নেতাজী-ফাইল

বিশেষ রচনা ঃ

অরুণ শৌরী

ডঃ নিমাইসাধন বসু

অশোক রুদ্র

মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস প্রমুখ

আনন্দমঠ প্রসঙ্গ

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

বনমানুষের হাড়

কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস

৪৩

(এর পর তৃতীয় প্রচ্ছদে)

সম্পাদকীয়

জনগণমন

গণতন্ত্র বস্তুটি কী ? তা কি শুধু রাজতন্ত্রেরই এক বিপরীতার্থক শব্দ ? বংশানুক্রমিক একক শাসনের বদলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির শাসন ? কিন্তু রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র যে পাশাপাশি চলতে পারে তার প্রমাণ গ্রেট ব্রিটেন ও জাপান। গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য যদি হয় শত পুষ্পের প্রস্ফুটন, তা হলে এই দুই দেশে নির্দ্বিধায় সমস্ত মতামতই প্রকাশিত হতে পারে। এমন কি সাম্যবাদী চিন্তাধারার ওপরেও সে দেশে কোন নিয়ন্ত্রণ আনা হয় না। আবার রাজতন্ত্র বিবর্জিত এবং বিপ্লবের পর স্থাপিত বহু প্রজাতন্ত্র যা গণতন্ত্র নামে নিজেদের চিহ্নিত করে সেখানে প্রতিষ্ঠান বিরোধীদের কোনমতেই বরদাস্ত করা হয় না। সরকার ও রাষ্ট্র যেসব দেশে সমার্থক সেসব দেশে সরকার বিরোধিতার অর্থই রাষ্ট্র বিরোধিতা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মানব অধিকার নিয়ে আজ মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ভীষণ ভাবে সচেতন কিন্তু মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্যবাদী চিন্তাধারার মানুষজনের প্রতি রাষ্ট্র কতখানি সহনশীল অথবা কতখানি সদয় ? অথবা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতেও দেশের অভ্যন্তরে মুষ্টিমেয় বিরোধীদের প্রতি রাষ্ট্র কতখানি সহনশীল ?

প্রকৃত গণতন্ত্রের অর্থ বিরোধী মত ও পথের প্রতি শাসক গোষ্ঠীর শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও উদারতা। গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ কদাচ মেজরিটির শাসন নয়, জনগণের শাসন। জনসংখ্যার যে বিরাট অংশ অরাজনৈতিক, যাঁরা কোন গোষ্ঠী বা দলভুক্ত নন অথবা গোষ্ঠীভুক্ত হলেও যারা মাইনরিটি গোষ্ঠী বলে পরিচিত, তাঁদের মতামতের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা না থাকলে কোন গণতন্ত্রই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষ ক্রমশ গণতন্ত্রের এই পবিত্র ধ্যানধারণা থেকে বিচ্যুত হয়ে দলতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। রাষ্ট্র ও শাসকদল ক্রমশ সমার্থক হয়ে উঠছে। চাকরি, আবাসন, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি সাধারণ নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় সম্মান ও পুরস্কার, অনুদান সমস্ত কিছুর পিছনে শাসকদল তাঁদের অনুগত ব্যক্তিদের খুঁজছেন। শাসকগোষ্ঠীর রাজনীতির যাঁরা বিরোধী শুধু তাঁদের নয়, যাঁরা কোন রাজনীতি করেন না তাঁদের পক্ষেও ভারতবর্ষে টিঁকে থাকা ক্রমশ মুশকিল হয়ে উঠছে। অথচ ভারতীয় সংবিধান সর্বতোভাবে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করেছে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের রক্ষাকবচ এখানে সুচিহ্নিত। শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় রাষ্ট্রপতির নামে, যিনি নীতিগতভাবে রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বে এবং জনগণকে সংবিধান প্রতিশ্রুত নিরপেক্ষ শাসন দিতে প্রতিশ্রুত। কিন্তু বস্তুত সর্বক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি শাসকদলের দলভুক্ত হতে না পারলে ন্যূনতম মৌলিক সুযোগ সুবিধা পাওয়াও ভারতবর্ষে দুরূহ।

এ ছাড়াও রাষ্ট্রজীবনে গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে চিৎকার করলেও ব্যক্তিগত জীবনে আমরা অনেকেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সমস্ত আদর্শকে মাড়িয়ে চলেছি। আমরা বেসরকারি পর্যায়ে—তা স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানেই হোক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিতেই হোক—গণতান্ত্রিক আদর্শ কতখানি রক্ষা করে থাকি ? এমন কি নিজের পরিবারের মধ্যেও আমাদের এই একনায়কসুলভ গণতন্ত্রবিরোধী মুখ মুখোশের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়ে।

ভারতীয় গণতন্ত্রের বয়স ৩৩ বছর হতে চলল। কিন্তু আমাদের গণতন্ত্রের নাবালকত্ব এতদিনেও ঘুচেছে কি ?

পরিবর্তন

২৬ জানুয়ারি ১৯৮৩, বর্ষ ৫ সংখ্যা ২৯,
দাম ২.২৫, বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা,
ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

এই সংখ্যায়

তবু আশা জেগে রয়
অরুণ শৌরী / ৫
ভারতীয় গণতন্ত্র ও মূর্খ কালিদাস
ডঃ নিমাইসাধন বসু / ১২
নেতাজী ফাইল
শিবপ্রসাদ চৌধুরী / ১৫
নেতাজীর রণনীতি শেষ পর্যন্ত জিতেছে
দেবেশ দাশ / ১৮
বন্দী সুভাষচন্দ্র ও একটি অনশনের কাহিনী
লাডলীমোহন রায়চৌধুরী / ২২
ইনডিয়ান প্যানোরামাই বেশি দর্শক টেনেছে
নয়া দিল্লি থেকে কলিন পাল / ২৪
সরকারি কারবারে লোকসানের জন্য দায়ী কারা ?
অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় / ২৬
আনন্দমঠ বারবার সংশোধন কেন ?
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় / ৩১
হিন্দুত্ব নয়, মানবতা
আবদুল জব্বার / ৩২
শেকসপীয়র তা হলে ইহুদী বিদ্বেষী ?
কবিরুল ইসলাম / ৩৩
এ মুহূর্তে আনন্দমঠ নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর
প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী / ৩৩
আনন্দমঠে নিরানন্দ
ক্ষুদিরাম দাস / ৩৪
সরোজবাবুর মানসিকতা ও বঙ্গভাগ / এ মাহমুদ
সাক্ষাৎকার : লাডলীমোহন রায়চৌধুরী / ৩৬
মাননীয় বিরোধী সদস্য
সাক্ষাৎকার : শ্যামল বসু / ৩৯
বৈষম্য বাড়ছে
অশোক রুদ্র / ৪৩
পদাতিকের নৃত্য উৎসব
অমিতা দত্ত / ৪৫
সুরের সাগর সাগর সেন
ছন্দা দাশগুপ্ত / ৪৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : নিতাই ঘোষ

প্রধান সম্পাদক : অশোক চৌধুরী
সম্পাদক : ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রীট,
(পুরাতন প্রিনসেপ স্ট্রীট), কলকাতা ৭০০০৭২

পরিবর্তন

২ ফেবরুয়ারির আকর্ষণ

বেকার ও ভবিষ্যতের কর্মপ্রার্থী তরুণরা যাতে কর্ম-সংস্থান ও প্রশিক্ষণের সুযোগ পেতে পারেন তার জন্য বহুবিধ তথ্য এই সংখ্যায় সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে বেকারি ও নানা শিল্পোদ্যোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কর্মপ্রার্থী ও ছাত্ররা অতি অবশ্য এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

পশ্চিমবাংলায় সবচেয়ে বড় সমস্যা আজ বেকার সমস্যা। পরিবর্তনের এই সংখ্যাটি ১৫ লক্ষ বাঙালি কর্মহীন তরুণের উদ্দেশে নিবেদিত হল।

বেকার সমস্যার ভয়াবহতা, এমপ্লয়মেনট একস-চেনজগুলির দুর্নীতি ও তাদের সীমাবদ্ধতা ও সেই সঙ্গে স্বয়ংনির্ভরতার মূল্যবান হদিশ।

বেকারি ঃ সমাধান কোথায় ?

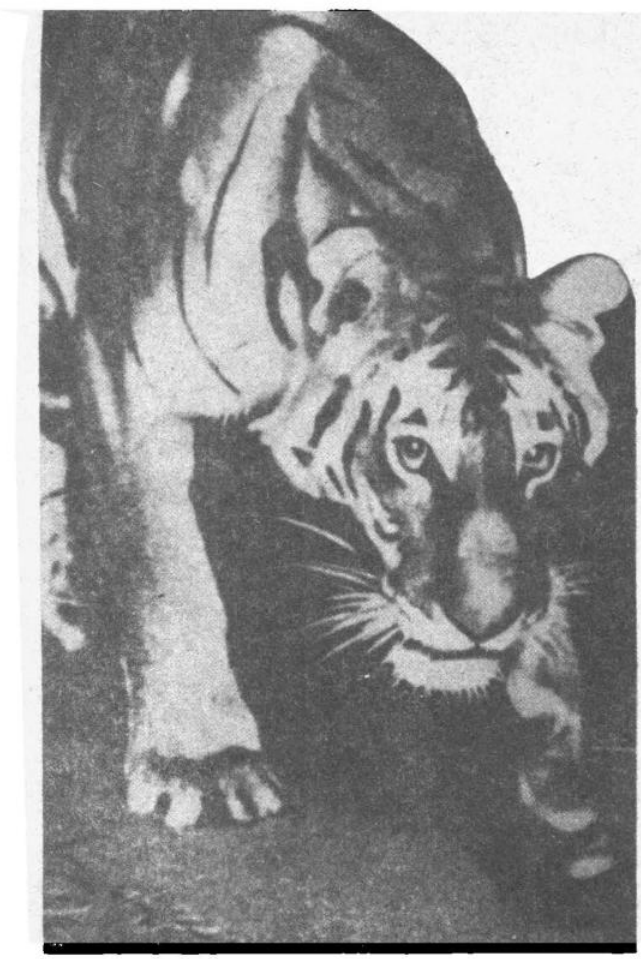

সম্প্রতি সুন্দরবন টাইগার প্রজেকট ঘুরে এলেন পরিবর্তনের প্রতিবেদক ও আলোকচিত্রশিল্পী। সুন্দর-বনের বাঘ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও টাইগার প্রজেকটের অগ্রগতি সরজমিনে পরিদর্শন করে আসাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। তিনি দেখে এসেছেন বাঘের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু চোরাগোপ্তা শিকারও চলছে অবাধে।

একটি চিত্তাকর্ষক প্রতিবেদন

প্রজেকট টাইগার

বোমবাই থেকে নিজস্ব সংবাদদাতার পাঠানো আর একটি চিত্তাকর্ষক প্রতিবেদন ঃ

দলিত প্যানথার

বাঘের নামে নাম এক মানব গোষ্ঠীর কাহিনী।

ত্রিপুরা, কর্ণাটক ও অন্ধ্রের নির্বাচনী বিশ্লেষণ। শেষের দুই রাজ্যে আঞ্চলিক দলের সাফল্য কি ভীতিপ্রদ ?

অতীতের বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও একালের চিন্তাশীল লেখক **অতুল্য ঘোষ** পরিবর্তনের জন্য করেছেন এক সুন্দর বিশ্লেষণ।

ডেটলাইন ঢাকা পর্যায়ে পরিবর্তনের ঢাকা প্রতিনিধি লিখেছেন

এরশাদ মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত করবেন

আরও নানা আকর্ষণীয় ফিচার।

মারচ মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লিতে যে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন হচ্ছে পরিবর্তন তার বিশেষ কভারেজ প্রকাশ করবে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের পশ্চাদপট সম্পর্কে অধ্যাপক জহর সেনের লেখাটি বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ না করে আমরা ২৩ ফেবরু-য়ারি সংখ্যায় প্রকাশ করছি।

ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা-৭০০০৭২

কিছু ভুল ছিল

গত ৩ নভেম্বর প্রকাশিত 'পরিবর্তনে' খৃস্টান কলেজ আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, আমি তার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(১) সরকারকে প্রদত্ত 'স্বেচ্ছাপ্রদত্ত শর্তাবলী' অভিহিত কাগজটির শুরুতেই আছে on behalf of the Governing Body···তারপর চারজনের সই আছে। এর মধ্যে আছেন তৎকালীন অধ্যক্ষ, দুজন গভরনিং বডির শিক্ষক প্রতিনিধি (যাদের সম্পূর্ণ বেআইনী-ভাবে অধ্যক্ষ মহাশয় নিজের কার্যাবলীর সুবিধার্থে নির্বাচন করিয়ে এনেছিলেন, যার রেকরড আছে মিনিটস বুকে) এবং গভরনিং বডির চেয়ারম্যান বিশপ রেঃ সন্তোষ কিসকু উক্ত কাগজটিতে রেঃ কিসককে চারচ প্রতিনিধি হিসেবে নিশ্চিতভাবে গণ্য করা যায় কী? রেঃ প্রধানের সই-এর প্রশ্নই ওঠে না এবং কার্যত তাঁর সই নেই। এরকম একটা সেনসিটিভ ইসুকে এই ধরনের উপস্থাপন কোন দায়িত্বশীল পত্রিকা কর্তৃপক্ষের কাছে আশা করা যায় না।

(২) আমার উক্তি প্রসঙ্গে আমাকে ফিজিকসের হেড অব দি ডিপারটমেনট হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে—এটাও ভুল। আমি উক্ত ডিপারটমেনটের অধ্যাপক।

(৩) আলোচনার শেষের কিছু অংশ অত্যন্ত বিস্ময়কর। নিগৃহীত অধ্যক্ষ এবং নিগ্রহকারী পার্থ দে-কে এক করে জনৈক অভিভাবকের নাম করে দোষারোপ করা হয়েছে। অধ্যক্ষ শ্রী কিসকু কলেজে যোগ দিয়ে অবধি নানাভাবে আবেদন করেছেন সহ-যোগিতার জন্য, বিশপের দেওয়া ২৮।৪।৪২-র চিঠিতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় কিভাবে অন্যান্যদের সঙ্গে চক্রান্ত করে সমাধানের সহজ পথ পরিত্যাগ করা হয়েছে, কিভাবে যে আন্দোলন সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত করার কথা তাকে মিশনের বিরুদ্ধে করা হয়েছে। পত্রিকায় প্রতিনিধির তথ্য সংগ্রহে নিষ্ঠা থাকলে জানতে পারতেন, তাঁকে জানানোও হয়েছে, কিভাবে বহু শিক্ষক অশিক্ষক কর্মচারীকে চাতুর্যের সঙ্গে ২০।৯।৪২-র কলংকজনক ঘটনায় প্রসূতি ও ব্যাপ্তির সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই ধরনের উপস্থাপন প্রকারান্তরে নিগ্রহকারীদেরই মনোবল বাড়ায়।

আশা করি ভুলগুলি সংশোধিত হবে।

দেবীপ্রসাদ রায়
বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, বাঁকুড়া

হেনা গাঙ্গুলির মৃত্যুর তদন্ত হোক

আপনার শারদীয় পুজো সংখ্যায় পরিবর্তনে 'সে দিনের ব্যাংক ডাকাতি ও হেনা গাঙ্গুলির মৃত্যু রহস্য' প্রবন্ধটি প্রকাশ হয়েছে। লেখাটির জন্যে তপেন্দ্র-মোহন চক্রবর্তী মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ এই জন্য যে জনতার দোষ দিয়ে পুলিশকে তিনি ধোয়া তুলসী পাতা করেছেন।

হেনা গাঙ্গুলির জনতার প্রহারে মৃত্যু হয়েছে বলে যে লিখেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। হেনা গাঙ্গুলি এমনভাবে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন যে গুলি তাঁর দেহের একদিক দিয়ে ঢুকে আর দিক দিয়ে বেরোয়। পুলিশই তাঁকে গুলির মালা পরিয়েছে। পুলিশের গুলিতেই হেনা গাঙ্গুলির মৃত্যু হয়েছে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরও তাঁর দেহে প্রাণ ছিল। তারপর হেনা গাঙ্গুলিকে ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলা হয়।

আমাদের দেশে ক'জন মানুষের হাতে রাইফেল থাকে যে জনতা তাঁকে গুলিবিদ্ধ করেছে? দ্বিতীয়ত জনতা তো জানত না, পুলিশই উস্কানি দিয়ে জনতাকে জাগিয়েছে। পুলিশ ১৯৬৯ সালে ৫ সেপটেমবরের আগে থেকেই ঐ জায়গার সমস্ত এলাকায় জাল ছড়িয়েছিলেন। পুলিশের যদি হিম্মৎ থাকতো তবে তাঁকে ধরে তাঁর বিচার করতেন। পুলিশ এই রকম নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে হত্যা করে জনতার উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে কি খুব বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন? হেনা গাঙ্গুলি সবাইকেই খুব বিশ্বাস করতেন বলে তাঁর জীবনের আজ এই পরিণতি।

আমরা ছোট বোনেরা একমাত্র আমাদের ছোড়দার উপর নির্ভরশীল ছিলাম। আজ আমাদের যে কি অবস্থা তা একমাত্র ভগবানই জানেন। আমাদের ছোড়দার হত্যাকারীকে ভগবান কোনদিনই ক্ষমা করবেন না। ছোড়দার মৃত্যুর তদন্ত কোনদিনই হয়নি। এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের দাবি আমরা সব সময়ই করছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সৎ সাহস থাকলে নিশ্চয়ই তদন্ত হবে।

এমনিতেই আমরা বড়ই শোকাতুরা। কয়েকদিন আগে আমাদের ছোট বোনটিকে হারিয়েছি। মাকেও হারিয়েছি। আমাদের বাবাকে অনেকদিনই হারিয়েছি। এখন আমরা তিনটি বোন রোগে শোকে অর্ধমৃত অবস্থায় আছি। এখনও দেশ মরে যায়নি। একদিন দেশ জাগবে ও এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের বিচার করবে।

গোয়েন্দা পুলিশের লোক ১৯৬৯ সালে আমাদের গৌহাটির বাড়িতে এসেছিলেন। তখন আমার মা শয্যাশায়ী এবং আমরা বেশ ছোট ছিলাম ও খুব একটা সুস্থ ছিলাম না। তখন আমরা বাড়িতে চার বোন ও মা থাকতাম।

সেই অবস্থায় গোয়েন্দা পুলিশের লোক আমাদের বাড়িতে এসে চালে-ডালে এক করে সব তছনছ করেছিলেন। এমন কি রোগীর পথ্যটুকু পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলেছিলেন। অতীতের সেইসব অত্যাচারের কথা ভুলতে পারিনি। তা হলে এসবও কি জনতা করেছিলেন?

ছায়া গাঙ্গুলি, গৌহাটি-৮

নাম ভুল হয়েছে

৩ নভেম্বর '৮২ পরিবর্তনে প্রকাশিত দেবাশিস চক্রবর্তীর একান্ত সংবাদ 'বাঁকুড়া খৃস্টান কলেজে কি ঘটছে?' পড়লাম। লেখাটি নিঃসন্দেহে সময় উপযোগী এবং তথ্যভিত্তিক। এই বছর উক্ত কলেজ থেকে আমি Part—II পরীক্ষা দিই। খৃস্টান কলেজের ছাত্র হিসাবে ছোট্ট একটি ভুল চোখে পড়ল। এক জায়গায় শ্রী চক্রবর্তী লিখেছেন, '···খৃস্টান কলেজের ফিজিকসের হেড অব দি ডিপারটমেনট অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায় বললেন···। কিন্তু আমরা ভালভাবেই জানি খৃস্টান কলেজের ফিজিকসের হেড অব দি ডিপারটমেনটের নাম অধ্যাপক হরি-সাধন দে। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায় হলেন ফিজিকস ডিপারটমেনটের সহকারী অধ্যাপক।

সৌমিত্র পাল, বার্ণপুর, বর্ধমান

প্রতিরোধ নেই

১৭-১১-৮২ পরিবর্তন সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা শীর্ষক আলোচনায়, ২৪ পরগণা সম্বন্ধে যে তথ্য উদ্ঘাটিত করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। আমরা যারা শহরতলিতে থাকি, তারাও এই রাহাজানি অথবা জোর জবরদস্তির শিকার। এখন সমাজবিরোধীদের সাহস এত বেশি যে, তারা প্রকাশ্যেই ছিনতাই করে। জোর করে যদি কেউ কিছু নিয়েও যায়, আমাদের কোন কিছু করার নেই। কারো কাছে অভিযোগ জানানো যাবে না—জানালে পৈতৃক এই প্রাণটির মায়া ছাড়তে হবে। এরপর হয়ত এমন দিন আসবে, যখন সমাজ-বিরোধীরা এসে আমাদের বলবে—'আমাদের কিছু নেই, তোমাদের আছে ···অতএব তার থেকে কিছু আমাদের দাও'—সেক্ষেত্রেও কিছু দিতে হবে, কারণ প্রতিরোধ করার যে মানসিকতা দরকার তা সকলেরই আজ অনুপস্থিত। একদিক থেকে কিন্তু সমাজবিরোধীদের মাথা তোলবার পথ আমরাই করে দিয়েছি।

শঙ্কর ভট্টাচার্য, কলকাতা-৮

র‍্যাগিং বাড়ছে

২৪ নভেম্বর পরিবর্তনে নিরুপমা বড়গোহাঞির লেখা 'নবাগত সব ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর আসু র‍্যাগিং চালাচ্ছে' প্রবন্ধটি পড়লাম, কিন্তু প্রবন্ধটি পড়লে নবাগত ছাত্ররা বিশেষ করে বাঙালি এবং বামপন্থী অসমীয়া ছাত্রদের কী রকম র‍্যাগিং-এর কবলে পড়তে হয় তা জানা যায় না। গৌহাটির বিভিন্ন কলেজ ছাত্রাবাসে বাঙালি ছাত্রদের যে ধরনের র‍্যাগিং-এর সম্মুখীন হতে হয় তা কল্পনার অতীত। বিশেষ করে গৌহাটির বিভিন্ন কারিগরী কলেজের ছাত্রাবাসগুলিতে সারা বছর ধরে বাঙালি ছাত্রদের ওপর র‍্যাগিং-এর নামে অমানুষিক অত্যাচার চালান হয়।

র‍্যাগিং সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই করা হয়। আন্দোলনের জন্যেই নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর আসু র‍্যাগিং চালাচ্ছে একথা ঠিক নয়। আন্দোলন শুরু হবার অনেক বছর আগে থেকেই বাঙালি ছাত্রদের এবং বামপন্থী অসমীয়া ছাত্রদের ওপর অমানুষিক ভাবে র‍্যাগিং করা হয়। বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই বাঙালি ছাত্রদের ওপর র‍্যাগিং-এর মাত্রা অসম্ভব ভাবে বেড়ে যায়। **উদয় সাহা**

গোয়ালপাড়া, আসাম

কেন হেনস্থা?

২৯ সেপটেমবর সংখ্যায় লীলা ঘোষের 'কী অপরাধ করেছেন আমার মা' শীর্ষক চিঠি ও তাঁর মা ডাঃ পুষ্পিতা শূর রায় (ঘোষ)-এর বেদনাদায়ক ফটোটি প্রকাশ করে আশা করি আপনারা আমার মত পরিবর্তনের অসংখ্য পাঠকের কাছে ধন্যবাদার্হ হবেন। ভাবতে অবাক লাগে পশ্চিমবাংলার জনদরদী সরকার থাকতেও কী করে একজন ইন্দিরা মাতৃ ও শিশুকল্যাণের সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ সুপারিনটেনডেনটকে গত ন মাস ধরে তাঁর বেতন বন্ধ করে দিয়ে তাঁকে চরম হেনস্থা করা হচ্ছে।

সৌমিত্র দেব সরকার
পিঙ্গলপাতি, হুগলী

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান

GLC.6-2416 BG (R)

একমাত্র কমপ্লান®-এই আছে এদের প্রতিদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় ২৩টি খাদ্যগুণ

সাধারণতঃ ১৫ বা ১৬ বছর বয়েসের মধ্যে ছেলেমেয়েরা প্রায় সর্বদিক থেকে পুরোপুরিভাবে বেড়ে ওঠে, তাই এদের প্রয়োজনও হয় বিশেষ ধরণের।

আর এই একই কারণে আপনার ছেলেমেয়েদেরও **কমপ্লান** দেওয়া চাই—এখনই! **কমপ্লান** শুধু যে প্রোটিন (২০%) যোগায় তাই নয়, এ থেকে ছেলেমেয়েরা সেরা প্রোটিন (মিল্ক প্রোটিন) পায়। এছাড়া, এতে ২২টি অন্যান্য খাদ্যগুণও আছে, যা ছেলেমেয়েদের বাড়ন্ত বয়েসের জন্যে একান্ত প্রয়োজন। মনে রাখবেন, **কমপ্লান** হল সুপরিকল্পিত আহার যা ডাক্তাররাই বেশী করে সুপারিশ করে থাকেন।

কমপ্লান পাওয়া যায়— চকোলেট, এলাচ-জাফরান ও স্ট্রবেরীর মুখরোচক স্বাদগন্ধে—আর প্লেনও।

বিনামূল্যে! ৩২ পৃষ্ঠার পুস্তিকা

"সারা পরিবারের সম্পূর্ণ পুষ্টির জন্যে পরামর্শ"-এর জন্যে অনুগ্রহ করে ৫০ পয়সার ডাকটিকিট সমেত এই ঠিকানায় লিখুনঃ পোস্ট ব্যাগ নং ১৯১১৯ (কম্প্) জি-২৪৪, বম্বে-৪০০০২৫।

কমপ্লান® সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার।

শাসকশ্রেণী এবং সাধারণ মানুষ—ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এই দুই পক্ষ পরস্পরের থেকে দূরেই থেকে গেছে। বিশেষত প্রান্তসীমার মানুষ-জন তো এতদিন রাজনীতি ও সামাজিক ব্যাপারে কোন অংশই নেননি। লেখক প্রখ্যাত সাংবাদিক অরুণ শৌরী নতুন ইতিহাসের পটভূমিকায় ভারতীয় সেই অবহেলিত মানুষের নব জাগরণের কাল এগিয়ে আসছে বলে মন্তব্য করেছেন। নিদারুণ হতাশার মধ্যে সেটিই তাঁর কাছে একমাত্র আশার কথা।

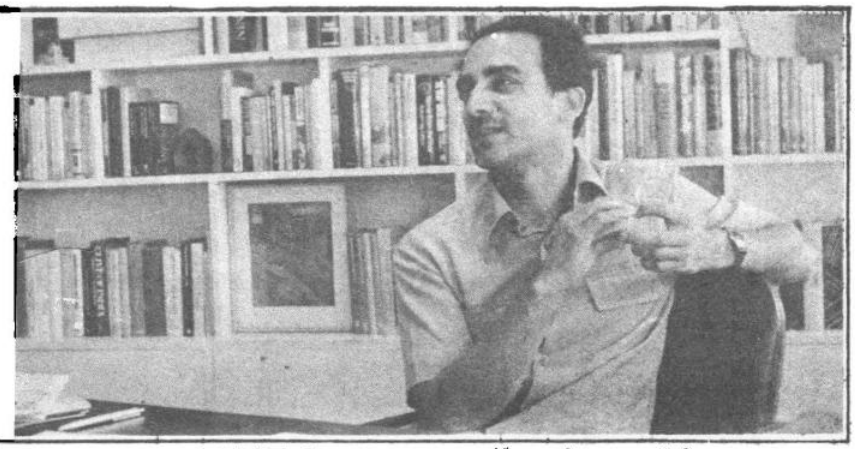

অরুণ শৌরী / আলোকচিত্র : গৌতম রায় বর্মন

তবু আশা জেগে রয়

অরুণ শৌরী

বর্তমান পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি আমাদের ক্রমশই যেন এক প্রচণ্ড সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, সংঘাতের প্রাথমিক দাপট স্তিমিত হয়ে যাবার পর মনের গভীরে জমে উঠছে নৈরাশ্য আর বিষণ্ণতা। ফলে আমরা কেমন যেন একটা হতাশায় শিকার হয়ে পড়ছি। সংঘাতের যা হোক তবু একটা গতি, রীতি খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু বিষণ্ণতা বা হতাশার তো কোন নির্দিষ্ট রূপরেখা নেই। আমাদের চারপাশে দিনেরাতে নানান অশুভ ঘটনা ঘটতে দেখেও আমরা ভীত, শঙ্কিত নই। আমরা আর্তনাদ করে উঠি। কিন্তু আমাদের আর্ত চিৎকারে সাড়া দিতে কেউ এগিয়ে আসে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা মন্দ থেকে মন্দতর হতে থাকে—আমাদের মন ভরে ওঠে নিরাশায়।

এখন বলা যেতে পারে যে, নানান সামাজিক অব্যবস্থা দূর করার প্রয়াসেই তো গড়ে ওঠে নানান আন্দোলন। যেমন নবনির্মাণ, ১৯৭৩-৭৪ সালের বিহারের ছাত্র আন্দোলন কিংবা ইদানীং কালের আসামের আন্দোলন। কিন্তু বক্তব্যের বিষয় এই যে, এ ধরনের আন্দোলনের গতিও কিন্তু ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে, অথচ যে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন তা কিন্তু অত সহজে লুপ্ত হয় না, বরং সেই শক্তির ক্ষিপ্রগতি আন্দোলনকারীদেরও ঠেলে দেয় হতাশার দিকে। এ ধরনের পরিস্থিতি আমাদের বাধ্য করে আক্ষেপ করতে যে, 'হায়! আজ যদি গান্ধীজীর মত কেউ একজন আমাদের পথপ্রদর্শক থাকতেন, কেউ আমাদের ভুল শুধরে দিতেন…' কিন্তু যেহেতু আমাদের আশেপাশে গান্ধীজীর মত নির্ভরশীল কাউকে পাই না, আমরা হতাশ হই। ঘটনা পরম্পরার অশুভ প্রকাশ, আন্দোলনের ব্যর্থতা, গান্ধীজীর মত ব্যক্তিত্বের অনুপস্থিতি আমাদের মনকে ক্রমশই হতাশার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে। অবশ্য অনেক সময় ব্যক্তিগত দম্ভও হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আত্মমূল্যবোধকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে আমরা আমাদের ক্ষমতার কথা বাড়িয়ে বলি; কিন্তু প্রয়োজনে যখন আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আমাদের নিজেদের আয়ত্তে রাখতে পারি না তখন হতাশায় মন ভরে ওঠে। ব্যক্তিগত সামান্য প্রচেষ্টার সফলতাকে আমরা অনেক সময় বিরাট কিছু করছি বলে ভাবি, কিন্তু যখন কোন আন্দোলনের প্রচণ্ড বেগ আমাদের ক্ষুদ্র অহংবোধকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তখন নিজের অসারতা হতাশার সৃষ্টি করে। নিরাশাবাদ আর হতাশা আমাদের মনকে এমন একটা ভাবনায় ভরিয়ে তোলে, যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের ওপর ন্যস্ত কর্তব্যগুলি পালনের দায়িত্ব থেকেও নিজেদের সরিয়ে আনি। অবশেষে ভুল ধারণা-জাত এই নৈরাশ্য এবং হতাশা আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, আসে দায়িত্বগ্রহণে অনীহা, চাই আয়াস।

অবনতি এবং পুনর্গঠন

ধারাবাহিকতার অবনতি এবং তার পুনর্গঠনের মধ্যে দুটি গতি আমাদের চোখে ধরা পড়ে—ঘটনা পরম্পরায় একটি প্রকট হয় জনজীবনের কর্মধারায় এবং অন্যটি জন-মানসের গভীরে—যার প্রকাশ ঘটে ধীরগতিতে অনেক সময় ধরে। সঠিক তুলনা দিতে গেলে বলতে হয় আলো জ্বালান আর নির্বাপনের মত ত্বরিতগতি নয়, হিমবাহ অবরোহণের মত শ্লথগতি। ভারতবর্ষের মত একটি উপমহাদেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে আভ্যন্তরীণ অক্ষমতার জন্য। বাইরের আক্রমণ শুধু শেষ আঘাতটাই হানে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল মধ্যযুগে রোমের অধঃপতিত গোপদের শাসনকাল, মুঘল সাম্রাজ্য ও বর্তমানে

আলোকচিত্র : মৃণাল পাল

আমাদের পরিষদীয় সংগঠনসমূহ। এই অধঃপতনের কারণ হল ক্ষমতাসীন শাসনকর্তাদের কার্যকলাপ—অবৈধ আচরণ, অপদার্থতা ও উৎকোচের বিনিময়ে কার্যোদ্ধার করার মত পাপাচার —যার চাক্ষুষ উদাহরণ হিসাবে রোমের শাসক পাদ্রীরা, মুঘল শাসনকালের শেষ কয়েকজন সম্রাট ও তাদের সুবেদাররা এবং বর্তমানকালের ভজনলাল আর জগন্নাথ মিশ্রের দলের কথা বলা যায়। ক্ষমতায় এসে প্রত্যেকেই যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির কাজে নেমে পড়ে তা হল স্বার্থসিদ্ধি আর নিজেদের পকেট ভারি করা। এই ধরনের লোকেরা অথবা তার প্রতিবেশীরা এতই আত্মকেন্দ্রিক যে, যাদের কাছ থেকে মদত পেয়ে তারা নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করে থাকে সেই জনসাধারণ, স্বদেশ বা পারিপার্শ্বিক বিধিব্যবস্থার জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করার মত অবসর তাদের হয় না। এবং এর প্রমাণ তো আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে—একজন ভজনলাল কি উত্তর-পূর্ব সীমান্তের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে কিছুটা সময় ব্যয় করেন কিংবা একজন আনতুলে কি কখনও পানজাবের হিন্দু-শিখদের মধ্যেকার উত্তেজনার কথা ভাববেন?

তবে অবক্ষয়ের ক্রমপ্রকাশ কিন্তু শুধুমাত্র উপরতলার নেতৃস্থানীয় কিছু লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তারা এর প্রসারে সাহায্যে করেন, এই ধরনের অধঃপতনকে জনগ্রাহ্য হয়ে ওঠায় বৈধভাবে মদত দেন ফলে এই অবক্ষয়ের শিকার শুধু তারাই হন না, গোটা সমাজকেই হতে হয়। একটা বিশিষ্ট সভ্যতা বা কালের অবক্ষয় সূচিত হয় তখন থেকেই, যখন সমাজের অধিকাংশ মানুষই অশুভ শক্তিকে মদত দেয় ও পরিণামে ঐ অশুভ শক্তি সমাজের বা জনজীবনের প্রচলিত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে। ইতিহাসের পাতা ওলটালে এ ধরনের ঘটনার অজস্র প্রতিফলন চোখে পড়ে। যেমন, পলাশীর নামমাত্র যুদ্ধের পর ক্লাইভ যখন মুরশিদাবাদ শহরে প্রবেশ করল তখন তার সঙ্গে ২০০ গোরাসৈন্য আর ৩০০ ভারতীয় সিপাহী ছিল, তাদের দেখবার জন্য শহরের উপান্ত পর্যন্ত পথের দুপাশে যত লোক সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের প্রত্যেকেই যদি একটা করে পাথরের টুকরোও ছুঁড়ত তাহলে সসৈন্যে ক্লাইভকে পাথরকুচির কবরের নিচেই চাপা পড়ে মরতে হত। কিন্তু তা হয়নি। আসলে ভারতবাসীরা নিজেরাই ব্রিটিশ শক্তিকে নিজেদের ওপর শাসন চালিয়ে যাবার শক্তি জুগিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ১৯৩০ সালের কাছাকাছি ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৫ কোটি ৩০ লক্ষের মত, সেই সময় ইউরোপীয়ানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১,৫০,০০০ মাত্র! এর মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১,১০,০০০ আর সশস্ত্র বৃটিশরা ছিল সংখ্যায় ৫৫,০০০ থেকে ৬০,০০০। একসময়ে ভারতবর্ষে বৃটিশ সেনানিবাস ছিল মাত্র ১৫,০০০। এর কমও দেখা গেছে, দশ লক্ষ থেকে পনের লক্ষ মানুষের বাসসম্পন্ন একটা জেলাকে দোর্দণ্ডপ্রতাপে শাসনে রাখছে মাত্র দুজন কিংবা তিনজন অফিসার পর্যায়ের উচ্চপদস্থ কর্মচারী—একজন জেলা কলেকটর, একজন পুলিশ সুপারিনটেনডেনট ও আরও দু-একজন।

কিন্তু একটা প্রশ্ন আজও সমানভাবেই তোলা যায় যে, মধ্যবিত্ত সমাজের সহযোগিতার যে ভূমিকা আমরা অতীতে খুঁজে পাই বর্তমানেও কি তার কোন ব্যতিক্রম আমাদের চোখে পড়ে কিংবা পরিস্থিতি পরিচালনার ক্ষেত্রেও যে অবদমনের নজীর খুঁজে পাওয়া যায় তারই কোন ইতর বিশেষ কোথাও ঘটেছে কি?

সহযোগিতা বা হাত মেলানোর কারণটা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কেউ কেউ এ প্রসঙ্গে শাসকদের উদাহরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেন আবার কেউ কেউ বলেন কালের গতির নিয়মে অবনতি একদিন ঘটবেই এবং দেশের জনসাধারণ এই অবশ্যম্ভাবী পতনের কথা নিশ্চিন্তভাবে উপলব্ধি করেও পরিণতির দিকে সক্রিয়ভাবেই এগিয়ে যাবে। বর্তমানকালের উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করলে এ অবস্থাটা চোখে পড়বে। তারা জেনেশুনেই অন্যায় করে অন্যায় আচরণকারীদের প্রশ্রয় দেয়—অথচ একদিন এই অশুভ মিলন যে তাদের নিজেদের ঘরই ভাঙবে সে সম্বন্ধে অবহিত হয়েও কোন প্রতিরোধের চেষ্টা করে না। এর কারণ হয়ত এই হতে পারে যে, তাদের নিজেদের পায়ের নিচে এত শক্ত বুনিয়াদ নেই যার ওপর দাঁড়িয়ে তারা বাধা দিতে পারে অথবা এও হতে পারে যে ঐ অন্যায়ের কেন্দ্রভূমি সমাজের এত উপরতলায় এবং তার আঘাত এতদূরে এসে আঘাত করছে যার আঁচ আপাতত তাদের গায়ে এসে লাগছে না। এ প্রসঙ্গে ১৮শ শতাব্দীতে ভারতে সফরকারী ইংরাজ লেখক লুক স্ক্যাপটনের যে উদ্ধৃতি নীরদ চৌধুরী উল্লেখ করেছেন তা স্মরণ করা যেতে পারে।

'শাসন ক্ষমতার পরিবর্তনে সাধারণ ভারতবাসীর মনে যে বিশেষ কোন আলোড়ন সৃষ্টি হয় না, তা লক্ষ্য করে একজন ইংরাজ বিস্মিত না হয়ে পারে না। মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া কারও যেন এ ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা নেই। আক্রমণকারীরা পারস্যদেশিই হক বা তাতারই হক তা নিয়ে অধিকাংশ দেশবাসীর কোন ভাবনা-চিন্তাই নেই, কারণ তারা মনে করে দেশে যে শাসকই আসুক না কেন কেউই জনগণের ভালর জন্য কিছু করবে না, তবে দেশে অরাজকতা দেখা দিলে তারা কিছুটা বিচলিত হয় কারণ সেক্ষেত্রে তাদের সাধারণ জীবন-যাত্রা খানিকটা ব্যাহত হয়, আক্রমণের ছোঁয়াচ তাদের ওপরও এসে পড়ে।' এখনকার এই বিংশ শতাব্দীতে বিহারের ভূমিহীন কৃষকদের নিয়ে সংবাদপত্রে যে প্রচণ্ড লেখালেখি চলছে, কিংবা মতেই হোক আর অমতেই হোক বিচারকদের বদলি নিয়ে যে বাদানুবাদ শুরু হয়েছে অথবা দেশে রাষ্ট্রপতিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বনাম সংসদীয় গণতন্ত্রের বিষয়টিকে ভিত্তি করে যে আলোচনার ঝড় উঠেছে তার প্রতি জনসাধারণের যে অনীহা তা যদি কোন বিদেশি আগন্তুক লক্ষ্য করে তবে কি সে একই মন্তব্য প্রকাশ করবে না?

নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার এই যে প্রক্রিয়া, যা নিঃসন্দেহে একদিন গোটা সমাজকে নিঃশেষে ধ্বংস করে দেবে, তারই সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার, সহযোগিতা করার পিছনে কারণ যাই থাক, তার প্রকাশ কিন্তু আমরা বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরেই প্রকট হয়ে উঠতে দেখছি। এই জীবনাবর্তে পড়ে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই আজ নিজস্ব ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে—একটা অস্থিরতায় ভুগছে। কোন একটি বিশেষ সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান আজ এই আবর্তের বাইরে এসে আর সব সংগঠনকে আগামী দিনের ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারছে না। কারণ অন্যান্য সংগঠন এই কুষ্টিপাকের ঘূর্ণি থেকে মুক্ত হতে পারছে না আর তাই ঐ একটি বিশেষ সংস্থার পক্ষে একক শক্তি দিয়ে কিছু করে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের পরিষদীয় সংগঠনগুলি, আমাদের আদালত, পুলিশী ব্যবস্থা বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কিংবা সংবাদ-সংস্থার মত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই কি একই রকমের অস্থিরতায় ভুগছে না? সমাজব্যবস্থাকে এই অস্থিরতা থেকে, এই অবক্ষয় থেকে মুক্ত করতে গেলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। কেননা এ অবস্থা অনেকটা শরীরের প্রত্যেকটি কোষ জুড়ে ছড়িয়ে পড়া বিষাক্ত রোগের মত যা সারিয়ে তুলতে হলে শুধুমাত্র ডানহাতের বুড়ো আঙুল বা ডানপায়ের বুড়ো আঙুলকে রোগমুক্ত করলেই চলে না—সামগ্রিকভাবে সমস্ত শরীরের চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে। সমাজের অবক্ষয়ের ধারা প্রবাহিত হয় অতি ধীর-গতিতে। প্রতিটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের জীবনধারার মধ্য দিয়ে অশুভ শক্তি অত্যন্ত সন্তর্পণে বিস্তার করে চলে তার কুহকজাল। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত তার আবির্ভাব ঘটে না। তাই সমাজকে সচেতন করে তোলার প্রয়াসে, অবক্ষয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার কাজে প্রতিটি পদক্ষেপে যথেষ্ট সাবধানতা ও বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, পরবর্তী অবস্থা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। সুতরাং এই কাজের উপযোগী বিশেষ কোন দিনক্ষণ বা এমন কোন পরা-শক্তিও নেই যা হঠাৎ করে মানুষকে সজাগ করে তুলতে পারে। অতএব একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সমাজের এই অবক্ষয় থেকে বাঁচতে হলে প্রতিটি মানুষকেই হতে হবে সতর্ক, প্রত্যেককেই সচেষ্ট হতে হবে যাতে নিজেদের কু-অভ্যাসগুলি দূর করা যায়। কেননা প্রত্যেকটি মানুষই যে এক ধরনের অবক্ষয়কর অভ্যাসের দাস এবং সে ঐ অবস্থাকে মানিয়ে নিয়ে দিনগত পাপক্ষয়ের একটা পরিবেশ নিজেই সৃষ্টি করে নেয়। অবশ্য ঐ অবস্থা থেকে উঠে আসবার মত শক্ত মাটি হয়ত তার পায়ের তলায় নেই, নেই সহ্য করার মত শক্তি, তাই স্রেফ বেঁচে থাকার দৈনন্দিন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তাদের

দেশের শাসকদের তারা যতটা শক্তিশালী মনে করে ততটা শক্তিশালী তারা নয়, পক্ষান্তরে জনগণ নিজেদের যতটা শক্তিশালী মনে করে তার তুলনায় তারা অনেক বেশি শক্তিধর।

আমাদের পরিষদীয় সংগঠনগুলি, আমাদের আদালত, পুলিশী ব্যবস্থা বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কিংবা সংবাদ-সংস্থার মত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই কি একই রকমের অস্থিরতায় ভুগছে না?

অবক্ষয়ের পচন ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং একদিন ক্রমে তা লয় পায়।

অন্যদিকে এই ধীরগতির প্রক্রিয়াটি কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এই অবক্ষয় থেকে মুক্ত হবার বেলায়ও কার্যকর হয়ে ওঠে। বহুদিন ধরে বহু মানুষের মেলামেশা ও জীবনধারণের পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অবক্ষয় যেমন তার প্রসার ঘটায় তেমনি বেশ কিছু মানুষ যখন মনে মনে উপলব্ধি করে যে, এই অসহ্য অবস্থা চিরকাল চলতে দেওয়া যায় না, তখন তারা প্রস্তুত হন অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রয়াসে। অবশ্য এজন্য তাদের স্বীকার করে নিতে হয় যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা আর লাঞ্ছনার বিভীষিকা।

ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ কিন্তু বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তি পাবার জন্য যুদ্ধ করেনি, প্রায় একশ বছর পার হয়ে যাবার পর যখন তারা উপলব্ধি করল যে বৃটিশদের এদেশে থাকবার কোন দৈবঅধিকার নেই, তাদের এদেশের মাটি ছেড়ে যেতেই হবে তখনই সম্ভব হল তাদের বিতাড়িত করা। সুতরাং মোদ্দা কথা হল যে, অল্প কিছুসংখ্যক লোকের প্রয়াস নয়—শাসকশ্রেণীর উৎকোচ বা নজরানা দিয়ে কাজ হাসিলের চেষ্টা নয় এমনকি মুক্তিকামী দেশভক্তদের বীরত্বও নয়—বহু মানুষের পারস্পরিক ভাব ও কাজের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা মানসিকতাই হল অবক্ষয় থেকে মুক্তি পাবার মৌলিক শক্তি।

বর্তমান পরিস্থিতি

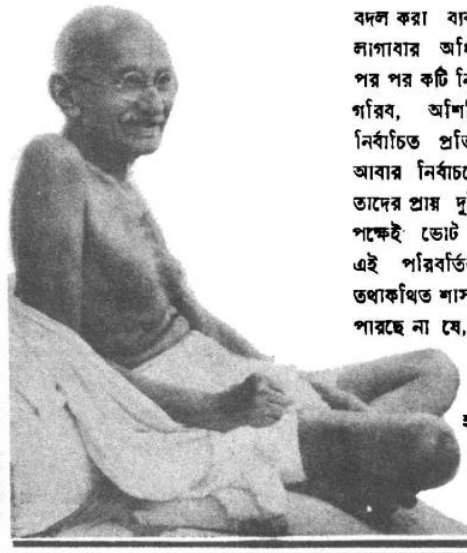

দেশের জনগণ যতই চোখ বুঁজে থাক না কেন, পরিবর্তন আসবেই। আর তার ধাক্কায় সেই চোখের পাতাও যাবে খুলে। জনসাধারণের নিস্পৃহতা বুদ্ধিজীবীদের নিরাশ করলেও কার্যত দেখা যায় যে, সময় তার ভূমিকা ঠিকই পালন করে চলেছে। তাই দল বা শ্রেণী নির্বিশেষে প্রত্যেকেই এই আন্দোলনজাত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন করে শিক্ষা নিতে শেখে। নতুন নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার দৌলতে সমাজে আজ নতুন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, আবিষ্কৃত হয়েছে ভাব বিনিময়ের নতুন নতুন পন্থা। এখন পুরনো ভাবনা-চিন্তা নিয়ে ভাবতে বসলে অন্য আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। যেমন অস্পৃশ্যতার বদ অভ্যাস গান্ধীজীর উপবাসকেও হয়ত তোয়াক্কা না করতে পারে কিন্তু যাত্রীবোঝাই বাসে ছোঁয়াছুঁয়ির কৌলিন্য কি বজায় রাখা সম্ভব হয়? সেইভাবে আমি হয়ত বর্ণহিন্দুদের জন্য তৈরি ইঁদারা থেকে জল খেতে একজন হরিজনকে অনুমতি নাও দিতে পারি কিন্তু পৌরসভার যে কল থেকে আমি জল খাই সেই কল থেকে তাকে জল খেতে কি বারণ করতে পারি অথবা যে জলসরবরাহ কেন্দ্র থেকে আমার পানীয় জল সরবরাহ করা হয় সেখানে কাজ করা থেকে কি তাকে বিরত রাখতে পারি? এই নতুন ভাব, নতুন প্রয়োগ প্রথার প্রচলন দেখে আমি এই সত্যেই উপনীত হয়েছি যে, প্রকৃতিকেও নিজের প্রয়োজনে খুশিমত কাজে লাগান যায়। সমাজে পরিবর্তন এবং সামাজিক কাঠামোর ভঙ্গুরতা (প্রসঙ্গত অস্পৃশ্যতা ও যাত্রীবোঝাই বাসের কথা স্মরণ করা যায়) এবং নতুন নতুন সুযোগ (যেমন পণ্ডিত নেহরুর মত ব্যক্তিদের দূরদর্শিতার অবদান—বয়স্কদের ভোটদানের অধিকার) ইত্যাদি লক্ষ্য করে আমার এই ধারণাই হয়েছে যে, সামাজিক রীতিনীতিগুলো প্রাকৃতিক নিয়মের মত দৃঢ়সংবদ্ধ নয় সেগুলো প্রয়োজনে পরিবর্তন করে নেওয়া যায়। হাজার হাজার বছর ধরে যারা জেনে এসেছে যে দেশের রাজন্যবর্গ বা শাসককর্তারা ভগবানের প্রতিনিধি, তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা যায় না, তাদের বিরোধিতা করা পাপ, তারাই আবার ১৯৭৭ সালের এক স্বৈরতন্ত্রী সরকারকে দেশের শাসনক্ষমতা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, ১৯৮০ সালে অযোগ্য সরকারকে সরে যেতে বাধ্য করেছে। এ থেকে কি আত্মবিশ্বাসের নবতর চেতনাবোধের প্রমাণ পাওয়া যায় না? সমাজব্যবস্থাকে যে প্রয়োজনমত বদল করে নেওয়া যায় দেশের সাধারণ মানুষ আজ সেটুকুই উপলব্ধি করতে পারছে তা নয় তারা এও মর্মে মর্মে বুঝতে পারছে যে ঐ

আলোকচিত্র : নিউজ ফটো এজেন্সি

বদল করা ব্যবস্থাকে নিজেদের কাজে লাগাবার অধিকারও তাদের আছে। পর পর কটি নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতের গরিব, অশিক্ষিত জনসাধারণ পূর্ব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে যারা আবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তাদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধির পক্ষেই ভোট দেননি। জনমানসের এই পরিবর্তিত রূপ থেকেই কি তথাকথিত শাসকশ্রেণী উপলব্ধি করতে পারছে না যে, জনসাধারণের চাবুকের দাগ পিঠে নিয়ে তাদের কথামতই চলতে হবে এবং তারা যখন ইচ্ছা করবে সরে যেতে হবে। এই আত্মোপলব্ধির, এই নবচেতনার

> যেহেতু আমাদের আশেপাশে গান্ধীজীর মত নির্ভরশীল কাউকে পাই না, আমরা হতাশ হই। ঘটনাপরম্পরার অখণ্ড প্রকাশ, আন্দোলনের ব্যর্থতা, গান্ধীজীর মত ব্যক্তিত্বের অনুপস্থিতি আমাদের মনকে ক্রমশই হতাশার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

প্রথম দিকে প্রতিটি দলই এই নবলব্ধ ক্ষমতাকে যথেচ্ছভাবে কাজে লাগিয়ে উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রতিটি কাজেরই একটা সীমা আছে। সে সীমা ছাড়ালেই শুরু হয় প্রতিক্রিয়া। ১৯৫০-এর দশকে প্রতিটি ধর্মঘটই ছিল অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে 'সংগ্রাম'। কিন্তু তার সে চেহারা আর নেই। সেই সময়ে প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়নের নেতা নিজেকে একজন সদাচারের প্রতিমূর্তি বলেই মনে করতেন কিন্তু আজ সেই রকম একজন নেতা ধানবাদের শ্রমিক শ্রেণীকে যে সব মস্তান পরিচালনা করছে তাদের দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে দেখছেন, দেখছেন বোমবায়ের দত্ত সামন্তকে আর ভাবছেন আইনকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে কিভাবে দেশের শিল্পসংগঠন বেঁচে থাকবে। অনুরূপভাবে নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ে জনসাধারণের মনে এই ধারণা জন্মাল যে, তাদের হাতে অধিকারের যে হাতিয়ার এসেছে তার সাহায্যে তারা নির্বাচিত অনভিপ্রেত সরকারের পতন ঘটাতে পারে। কিন্তু ইদানীংকার হালচাল দেখে কি সে কথা খুব জোর দিয়ে বলা যায়? আজ কি আর হরিয়ানার সাধারণ মানুষ চিন্তা করতে পারেন যে, যাদের তারা ভোট দিয়ে গদীতে বসিয়েছেন তারা সবসময়ই নির্বাচক মানুষগুলির উন্নতির কথা ভাববে? তা সত্ত্বেও জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে জনগণের মধ্যে যে একটা নতুন চেতনা দেখা দিয়েছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। আজ সংবাদপত্রের ভূমিকা কী? তা যদি লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যাবে সমাজের প্রয়োজনের দিকটা তুলে ধরতে গিয়ে নানান প্রাসঙ্গিক রচনা বা আলোচনা কত বেশি জায়গা করে নিচ্ছে। অথচ সে তুলনায় ২০ বছর আগে কী ছিল ভারতীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা?

সমাজ জীবনের এই পরিবর্তন আজ দারুণভাবে আঘাত হানছে সেইসব তথাকথিত রাজা-মহারাজা আর শাসক-শ্রেণীকে। তারা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টায় এতই হন্যে হয়ে উঠেছে যে, তাদের নগ্ন নির্লজ্জ রূপ বারে বারেই প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের চেহারা যে কী তা আজ বিহারের ভূমিহীন কৃষকদের বুঝিয়ে দেবার জন্য আর কোন প্রচারকের প্রয়োজন হয় না। গ্রামের দারোগা, আর জমিদার আর তাদের বশংবদের হাতের বন্দুকগুলিই সে ভূমিকা পালন করছে। গ্রামে গ্রামে মজুর অনুশাসনের দোহাই দিয়েও হরিজনদের আর অচ্ছুৎ করে রাখা যাচ্ছে না—তাদের ঘরের বাইরে বার করে আনা হচ্ছে রাইফেলের বাঁটের গুঁতোয় পিঠ ফাটিয়ে আর গুলি দিয়ে বুক ঝাঁঝরা করে। উপরতলায়ও আজ সেই একই ছবি। ইন্দিরা গান্ধীর চারপাশে সি সুব্রহ্মনিয়ম, অশোক মেহতা আর ডি পি ধরদের মত ভদ্র-শিষ্ট মোসায়েবদের হটিয়ে জায়গা করে নিয়েছে কয়েকজন ভজনলাল আর জৈল সিং-এর দল। শাসকশ্রেণীর টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করার কৌশল সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য আজ আর কোন লেখক দিয়ে প্যামফ্লেট লিখিয়ে প্রচার করার প্রয়োজন পড়ে না। একজন ভজনলাল এক সপ্তাহে যত লোককে শিক্ষা দিতে পারবেন, একজন লেখক লাগাতার দশ বছর ধরে আতরিক্ত শ্রম নিয়েও সে সাফল্য অর্জন করতে পারবেন না। এভাবেই আমাদের শিক্ষার বিস্তার লাভ করছে, শুরু হয়েছে সার্বিক উন্নতি, যে উন্নতির ফল ভয়াবহ এবং ক্রমবর্ধমান। শাসকরা আজ শিক্ষকের ভূমিকায় নেমেছেন।

সতর্ক পর্যবেক্ষকের দল

অবক্ষয় বা অধঃপতন শুরু হলেও সর্বক্ষেত্রেই কিছু সতর্কদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ থাকেন যারা অধঃপাতের গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে দেন না, ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, বঞ্চনা অত্যাচার, অপমান আর তথাকথিত সমাজের উপেক্ষা সহ্য করেও প্রকৃত সত্যকে আশ্রয় করে আত্মবিশ্বাসে অটল থাকেন। অবক্ষয়ের অবশ্যম্ভাবী পচনের ফলে যখন সামাজিক কাঠামো তার চারদিকে ভেঙে ভেঙে পড়তে থাকে সেই

স্বাস্থ্য ঝলমল, প্রাণে খুশী উচ্ছল! বোর্নভিটা খান।

আপনার পরিবারকে দিন ক্যাডবেরিস্ বোর্নভিটা যার স্বাদ তাদের খুব পছন্দ। স্বাদেভরা বোর্নভিটা, কোকো, মল্ট, দুধ, আর চিনির গুণে ভরপুর। বোর্নভিটা, আপনার পরিবারের সবাইকে প্রতিদিন দিন—দিনে দুবার ক'রে।

ক্যাডবেরিস্

বোর্নভিটা এর গুণ বলে, তুমি বেড়ে চলো!

ORM/8844/RN

ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা ওরই মধ্য থেকে নতুন সমাজ সম্ভাবনার বীজ খুঁজে বার করেন। এই সব ব্যতিক্রমী মানুষরা কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমাজের প্রান্তিক স্তর থেকে উঠে আসেন। যেমন আচার্য কৃপালনীর মত একজন অপরিচিত মানুষই মজফরপুরের অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করে গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন। কিয়াংসি লুটেরাদের একত্রিত করে একজন মাও-ই তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন নতুনতর জীবনবোধ। সমাজে যারা প্রতিষ্ঠিত, প্রসিদ্ধ বলে পরিচিত তাদের মধ্য থেকে এই ধরনের কাজে এগিয়ে এসে যোগ দিয়েছে এমন দু'চারজনের কদাচিৎ দেখা মেলে। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক. কারণ সমাজের চলতি ব্যবস্থার স্থিতাবস্থা থেকে এই সুবিধাভোগীর দল সবরকম সুখ ভোগ করে। বাইরে থেকে সমাজের এই রূপটাকে বেশ ছিমছাম, নিয়ম-নিষ্ঠা-সম্পন্ন বলেই মনে হয়, অথচ এর গভীরে যে কতরকম বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতা রয়েছে তা শুধু এই দলের কিছু কিছু সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন মানুষই অনুভব করে এবং সমাজের এই বিশৃঙ্খলাকে দূর করার জন্য সমাজ ব্যবস্থায় আনে আমূল পরিবর্তন। এ ধরনের ঘটনা ঘটে বলেই আমরা মাত্র কয়েকজন সি এফ অ্যানড্রুজের দেখা পাই, চিনতে পারি চৌ-এন-লাই-র মত মুষ্টিমেয় কয়েকজন নেতাকে।

এখন সমাজের প্রান্তসীমায় বসবাসকারী ভারতবাসীদের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় ভাববার আছে। প্রথমত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, দেশের সর্বত্র, সমাজের প্রত্যেক স্তরে, প্রতিটি রুগ্ন, ব্যাধিগ্রস্ত সংগঠনে এমন বহু নরনারী আছেন যারা অধঃপতনের গরলস্রোতে সামিল হতে চান না, অস্বীকার করেন অশুভ শক্তির সঙ্গে হাত মেলাতে।

বিচারাধীন বন্দীদের দিনের পর দিন জেলখানায় বন্দী রাখার ঘটনাটি নিয়ে প্রথমে লিখতে শুরু করেন কে এফ রুস্তমজী। যিনি তার চাকুরি জীবনের পুরোটাই কাটিয়ে দিলেন সেই পুলিশ বিভাগে যে বিভাগটিকে আমরা প্রায়ই উপহাস করে থাকি। রুস্তমজীর লেখার মধ্যে দিয়েই এরকম একটি অব্যবস্থার কথা দেশের লোক জানতে পারেন এবং তার ফলেই সুপ্রিম কোরটের বিচারপতিরা বন্দীদের মুক্তির আদেশ দেন। প্রায় ৪০,০০০ বন্দী মুক্তি পান।

ভাগলপুরে কয়েদিদের অন্ধ করে দেবার খবরটা জনসাধারণের কাছে প্রথম প্রকাশ করে ভাগলপুর জেলের অখ্যাতনামা জেল সুপারিনটেনডেনট এস আর দাস। শ্রী দাস নিজেও কিন্তু একজন জেল ওয়ারডেনের অনিশ্চকারী অত্যাচারী জেল কর্মচারীর পদ থেকেই উন্নীত হয়ে এসেছেন। ৩১জন কয়েদীকে অন্ধ করার অমানুষিক বর্বরতার অপরাধে পুলিশকে অভিযুক্ত করতে যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করে প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছিল, তার দায়িত্ব নিয়েছিল পুলিশ বিভাগেরই কয়েকজন কর্মী এবং এই ব্যাপারটি যার নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল তিনি বিহার পুলিশের যথেষ্ট নিন্দিত বিভাগ ক্রিমিন্যাল ইনভেসটিগেশন ডিপারটমেনটের একজন ডি আই জি ললিত বিজয় সিং।

আনতুলেকে মুখ্যমন্ত্রীর গদি থেকে যে কারণে চলে যেতে হল তার সপক্ষে প্রমাণসিদ্ধ সবরকম তথ্য জোগাড় করার দায়িত্ব যিনি নিয়েছিলেন তিনি স্বয়ং একজন সিভিলিয়ান। শুধু তাই নয়, নিজের পরিবারের লোকদের স্বার্থ আর অনুরোধ উপেক্ষা করে একটি তরুণই সর্বপ্রথম সেইসব তথ্য পরিবেশন করার সাহস দেখিয়েছিলেন। এইসব তথ্যের মধ্যে আনতুলে ট্রাসটের তরফ থেকে সিমেনটের বদলে অর্থ সংগ্রহ করার সমর্থনে সরাসরি লেখা চিঠিপত্রের নজীরও ছিল। আশ্চর্যের বিষয় অসমসাহসী এই তরুণটি কিন্তু বোমবের দুর্নামী গৃহনির্মাণকারী ব্যবসায়ীদের অন্যতম ধনী পরিবারের একজন উত্তরাধিকারী।

চাপের মুখে ভেঙে পড়া বিচার বিভাগে লেনটিন আর রেনের মত শক্ত মনের বিচারপতিরা যেমন আছেন, মানিয়ে চলার মনোভাবসিদ্ধ সিভিলিয়ানদের মধ্যেও তেমনি দেখা পাওয়া যায় পি এস আপপুর মত দৃঢ়চেতা অফিসারদের···।

দ্বিতীয়ত, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, উপরে বর্ণিত কিছুসংখ্যক মানুষ ঘটনার প্রবাহ লক্ষ্য করে এ কথাটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে বর্তমান পরিচালন পদ্ধতির কাঠামোর মধ্যে থেকে পদাধিকার প্রয়োগ করে বা লিখিত আদেশনামা জারী করে অবস্থার উন্নতি করা এখন সম্ভব নয়।

দেশের জ্ঞানীগুণী লোকেদের ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখা যাক। এই তো সেদিন ১৯৬৯-এ শ্রীমতী গান্ধী যখন রাজন্যভাতা বন্ধ করে দিলেন, ব্যাংক জাতীয়করণ করলেন এবং সমাজতন্ত্রের কথা বললেন তখন অনেকেই ভেবেছিলেন যে ভারতের মাটিতে আকাঙ্ক্ষিত বিপ্লবের নেতৃত্ব তিনিই দিতে পারবেন। কিন্তু আজ তাদের কজনই বা শ্রীমতী গান্ধীর বা ঐরকম কোন ব্যক্তিবিশেষের ঐ ধরনের ধোঁকাবাজির শিকার হবেন? কাজেই জনজীবনে যখন অবক্ষয়ের ভাঁটা শুরু হয় তখন নেতৃস্থানীয় বিখ্যাত ব্যক্তিদের ভাবভঙ্গী দেখে হতাশ হওয়াটা নিতান্তই ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তাদের আসা-যাওয়া গতানুগতিক ব্যবস্থার সপক্ষে কার্যকর কর্মসূচী, ঘটনাপ্রবাহের ধারা বেয়ে। অপরপক্ষে সমাজের প্রান্তসীমায় বসবাসকারী মানুষদের দিকে তাকিয়ে দেখুন তারা কি আমাদের চারপাশে নেই—তারা কি সংখ্যায় বাড়ছে না—তারা কি ফাঁকা বুলি আর অসাড় নেতৃত্বকে রেহাই দিচ্ছে?

আন্দোলনের ভূমিকা

গান্ধীজী যখন তাঁর আন্দোলন শুরু করেন তখন থেকেই আন্দোলনকে আমরা দেশের কল্যাণকর চূড়ান্ত পন্থা হিসাবে ধরে নিতে শুরু করেছি। আমরা দেখছি সময়ে সময়ে আন্দোলন শুরু হয়; কিছু লোক তাতে যোগ দেয়, কয়েক মাসের মধ্যেই আবার তা থেমে যায়। আমরা দেখি যে অশুভ শক্তিকে দমন করার জন্য আন্দোলন শুরু হয় শেষ পর্যন্ত সেই শক্তিই আন্দোলনকারীদের পিছনে ধাওয়া করে। অর্ধ শতাব্দী আগের ঘটনার কথা স্মরণে এনে আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি কেন আমরা চম্পারণ, বরদলৈ, খেড়া বা ডাণ্ডি অভিযানের মত আন্দোলন আবার গড়ে তুলতে পারছি না—যে আন্দোলনের ডাকে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সমুদ্রের ঢেউর মত ভারতের জনতা একের পর এক এসে আছড়ে পড়েছিল এবং নাটকীয়ভাবে নিজেদের দাবি আদায় করে নিয়েছিল। সারা দেশের মানুষের মনে বিদ্যুৎপ্রবাহের মত ছড়িয়ে পড়েছিল এক অদ্ভুত মনোবল—আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ নরনারী সমবেত হয়েছিল একই লক্ষ্যে।

এই প্রসঙ্গে অনেক কথা বলা যায়, আমি শুধু একটি বিষয়ই এখানে উল্লেখ করব। এই যে সারা ভারত উদ্বেলিত করা আন্দোলন, তার প্রতি নিরুৎসাহবোধের কারণ হল অত্যধিক ভাবপ্রবণতা আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই ধরনের আন্দোলনের মূল্যবোধ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা।

সমুদ্রের ঢেউ যেমন একের পর এক আসতে থাকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন কিন্তু তেমনভাবে পর পর আসেনি। এই আন্দোলনের প্রত্যেকটি স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য গড়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছিল। গান্ধীজী পরিচালিত বহু অভিযানই আমাদের কাছে আলোকসংকেতের মত। এই আন্দোলনগুলির আয়ু কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের। ১৯২০-২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের স্থিতিকাল মাত্র ১৮ মাস এবং ১৯৩০-৩১ সালের দুই পর্যায়ের আইন অমান্য আন্দোলন টিকেছিল যথাক্রমে একবছর ও ১৬ মাস মাত্র। চম্পারণ সত্যাগ্রহের আয়ু ছিল দুই মাস ও খেড়া ও বরদলৈর সত্যাগ্রহের কোনটিই ছমাসের বেশি টেকেনি। ডাণ্ডি অভিযানের প্রভাব ছিল মাত্র একমাস।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যারা যোগ দিয়েছিলেন তারাও কিন্তু সংখ্যায় খুব বেশি একটা ছিলেন না। সম্পূর্ণ আঞ্চলিক সত্যাগ্রহের কথা ছেড়েই দিলাম। ১৯২০-২১ এবং ১৯৩০-৩১ সালের সর্বভারতীয় আন্দোলনের ইতিহাসও কিন্তু মিশ্রফলই নির্দেশ করে। এই প্রসঙ্গে পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত: ভারতের বিভিন্ন জায়গার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মনে কিন্তু এইসব আন্দোলন সমানভাবে সাড়া জাগাতে পারেনি। এর প্রমাণ সেই সময়কার নথিপত্রে যথেষ্ট পরিমাণে মিলবে।

দ্বিতীয়ত: এই আন্দোলনের কোন কোন কর্মসূচী সফলতার মুখ দেখলেও, অনেকগুলি সে অর্থে সফল হয়ে উঠতে পারেনি।

তৃতীয়ত: জরুরী অবস্থায় যাদের বন্দী করা হয়েছিল তাদের বেলায় শ্রীমতী গান্ধী যেমন বলেছিলেন যে, দেশের লোকসংখ্যার তুলনায় তারা অতি নগণ্য, তেমনি এইসব আন্দোলনে যারা সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন তাদের সংখ্যাও বলা যায় অতি সামান্য। ১৯৩০-৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে ৬০,০০০ জন জেলে গিয়েছিল—এই সংখ্যা হল সারা ভারতের জনসংখ্যার এক শতাংশের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

চতুর্থত: সে সময়ে সমাজের উঁচুতলার মানুষ হিসাবে যারা প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁদের মধ্যে খুব কমই এইসব আন্দোলনে, সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। গান্ধীজী বললেন, 'খেতাব আর পদক বর্জন কর।' ১৯২০ সালের আগসট. মাসে ৫১৮৬ জন খেতাবধারীদের মধ্যে মাত্র ৬১ জন তাদের খেতাব, পদক বর্জন করেছিলেন। কিন্তু কেউই 'নাইট' বা ঐ জাতীয় বড় ধরনের খেতাব বর্জন করতে এগিয়ে আসেননি। গান্ধীজী বললেন— 'আদালত বর্জন কর' একজন ঐতিহাসিক, এ আই সি সি সির অসহযোগকারীদের রেজিসট্রি বই থেকে জানতে পেরেছেন যে মাত্র ১৮০ জন সে ডাকে সাড়া দিয়েছিল, অন্য আর একজন এ আই সি সির আইন অমান্য আন্দোলন অনুসন্ধান কমিটির রেজিসট্রি দেখে যে প্রতিবেদন রেখেছেন তা হল ১,৫০০ জন মাত্র ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।

এই রকম আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই একক বা দলগত-ভাবে যারাই এইসব আন্দোলনে যোগদান করেছেন তাদের অনেকেরই কিছু না কিছু মতলব ছিল। অবশ্য এমনও অনেকে ছিলেন, যারা দেশের পূর্ণমুক্তি আদায় করার উদ্দেশ্যে জীবন পণ করেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। প্রাচীনদের মধ্যে তথাকথিত 'লিবারেল' গোষ্ঠীর কেউ কেউ আন্দোলনে নেমে এসেছিলেন এই ভেবে যে তারা যদি যোগ না দেন তা হলে তাদের পক্ষে রাজনীতিতে টিকে থাকা মুশকিল হবে। ১৯২০-২১ সালের আন্দোলনে সব সম্প্রদায়ের যোগ দেবার বিষয়টি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে খিলাফত আন্দোলনের ডাকে মুসলিম সম্প্রদায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, হিন্দুদের চেয়ে বেশি সংখ্যায় ঐ সময়ে নির্বাচন বয়কট করতে এগিয়ে এসেছিলেন। মাদ্রাজে শতকরা যে ৫০টি ভোট পড়েছিল তার মধ্যে শহরতলিতে ভোটদাতাদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৮.৪ আর গ্রামাঞ্চলে ভোট পড়েছিল ১৪ শতাংশ। বোমবে শহরে ভোট দিয়েছিল আইনত মোট ভোটাধিকারী মাত্র আট শতাংশ, মুসলমানদের মধ্যে এই সংখ্যা ছিল ৪·৪ শতাংশ। আসামে ভোটাধিকার প্রাপ্তদের মধ্যে শতকরা ২৪.৭ জন হিন্দু ভোট দিয়েছিল, মুসলমান ভোটদাতাদের সংখ্যা ছিল ১১.২ শতাংশ বাংলার শহরতলিতে ভোটারদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৪০ জন হিন্দু আর মুসলমানদের সংখ্যা ১৬ জন। গ্রামাঞ্চলে সেই সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ৪০ জন হিন্দু আর মুসলমান ছিল ২৭। বিহারের শহরতলিতে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২৭.৩ আর মুসলমান ১২.১, গ্রামাঞ্চলে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল হিন্দু ৪২ শতাংশ, আর মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ২৮ জন ইত্যাদি।

১৯৩০ সালের অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। তখন খিলাফত আন্দোলনের স্মৃতি দেশবাসী প্রায় ভুলতে বসেছেন। হিন্দু মুসলমানের কলহ তখন বেশ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। কোন কোন আন্দোলনের ডাকে অবশ্য কখনও কখনও স্থানীয় অধিবাসীরা অধিক সংখ্যায় এসে যোগ দিয়েছিল, যেমন বিহারের চৌকিদারী ট্যাক্স, মধ্যপ্রদেশের বনবিভাগীয় আইন, অথচ জাতীয় আন্দোলনগুলিতে জনসাধারণকে অধিক সংখ্যায় যুক্ত করতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিশেষ সফল হতে পারেনি। তাই কেন্দ্রীয় আন্দোলনের পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন কতগুলি আন্দোলনকে সফল করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এই ভেবে যে, তাতে আদতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি স্থানীয় জনসাধারণের সমর্থন বেড়ে উঠবে।

প্রতিটি আন্দোলনকেন্দ্রিক অভিযান যতই এগিয়ে যেতে লাগল ততই অনুগামীদের মধ্যে বিভেদ প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। জওহরলাল নেহরু জাতীয় আন্দোলনকে যখন উত্তর প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত করতে চাইছিলেন তখন তার পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হল আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর জমিদার আর ছোট ছোট চাষীদের দ্বন্দ্ব। গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলন যখন সামগ্রিকভাবে এগিয়ে চলছিল, হিন্দু মুসলমানদের বিভেদ ঠেকিয়ে রাখা তখন ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠছিল। বিভিন্ন সত্যাগ্রহ শেষ হয়ে যাবার পর অনেক ক্ষেত্রেই পরিবেশ আবার আগের মতই হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই। গান্ধীজী যখন চম্পারণে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন বুঝতে পারলেন যে, সেখানকার জনসাধারণকে নীলচাষের সমস্যা থেকে মুক্ত করলেই হবে না—তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং এই শিক্ষা হবে ব্যাপকভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতি বিষয়ক শিক্ষা। তাই তিনি ছটি স্কুল স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি এ জন্য স্বেচ্ছাব্রতীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন এই আশা নিয়ে যে স্বেচ্ছাব্রতী কর্মীরা যে গঠনমূলক কাজগুলো করবে তা এই অভিযানের পক্ষে স্থায়ী ফলদায়ক হবে এবং সংগঠনের পূর্ণতা দান করবে।

প্রসঙ্গত যুদিক ব্রাউনের লেখা 'গান্ধীজীজ রাইজ টু পাওয়ার' পুস্তকটির অংশবিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন—'কেবলমাত্র ছজন বিহারবাসী স্বেচ্ছাসেবক তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিল, ফলে গান্ধীজীকে বোমবে প্রেসিডেন্সি থেকে ২১ জন স্বেচ্ছাসেবককে ডেকে আনতে হয়েছিল যাদের মধ্যে দশজনই ছিল তাঁর আমেদাবাদের নিজেদের আশ্রমের লোক।' ১৯১৭ সালের ১৪ নভেম্বর থেকে ১৯১৮-র ১৭ নভেম্বরের মধ্যে তিনটি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল এবং মোট ৩৮০টি ছেলেমেয়ে নিয়ে শুরু হয়েছিল পঠনপাঠন। ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি পড়ুয়াদের গড়পরতা উপস্থিতি কমে গিয়ে দাঁড়াল ৬০ জনে এবং মাত্র তিনজন স্বেচ্ছাসেবক শেষ অবধি রয়ে গেল।

প্রতিটি আন্দোলনের পর পরই কিছু কিছু বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে। যেমন ১৯৪৬ সালের ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি (যেমন অস্পৃশ্যতা বর্জন, মাদকদ্রব্য বর্জন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ইত্যাদি নীতিগুলি) যা পশ্চিমী সভ্যতার বিকল্প হিসাবে ভারতকে এক নতুনরূপে গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছিল তার কোনটিই সফল রূপ নিতে পারেনি।

বর্তমানের দিকে চোখ ফেরালে আমরা প্রথমেই দেখতে পাই যে, এই আন্দোলনগুলি অসফল হবার মূলে যে যে কারণগুলি বর্তমান, যার জন্য আমাদের মনে নিরুৎসাহ হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে তা গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন আন্দোলন সমূহের মধ্যে লক্ষণীয় দুটি বিষয় আছে।

প্রথমত পূর্বোল্লিখিত আন্দোলন সমূহে যোগদানকারীদের সংখ্যা থেকে আন্দোলনের সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়, কারণ আন্দোলনের মূলগত বিশেষ বিষয়টি এই সংখ্যাতত্ত্ব থেকে পাওয়া যায় না। বর্তমানে শ্রীমতী গান্ধীর সভায় যত শ্রোতা, দর্শক উপস্থিত থাকে গান্ধীজীর সভায় সে তুলনায় অনেক কম লোক উপস্থিত থাকত, অথচ তাঁকে শ্রদ্ধা করত লক্ষ লক্ষ মানুষ।

কাজেই আজ আমাদের এই পারস্পরিক ফলাফলের বিষয়গুলো ভেবে দেখতে হবে: বর্তমানে দেশে যে ব্যবস্থা চলছে তার প্রতি একটা মোহময় মানসিকতা থেকে দেশের মানুষ নিজেদের মুক্ত করতে পারছে কি না, নিজেদের দেশের শাসকশ্রেণীর আসল রূপ তারা উপলব্ধি করতে পারছে কি না, নিজেদের শক্তি সম্পর্কে তারা কতখানি সচেতন, দেশকে যুগোপযোগী করে তুলবার ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের অবদানের মূল্য সম্বন্ধে তারা সচেতন হয়ে উঠতে পারছে কি না? আমার মতে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর উত্তর হল —হ্যাঁ।

দ্বিতীয়ত প্রতিটি সত্যাগ্রহ আন্দোলন যেমন শুরু হয়েছিল, তেমনি ধীরে ধীরে থেমেও গেল, দেখা গেল দেশের অতি সামান্য একটি অংশই এতে যোগ দিয়েছিল, এবং আন্দোলনের বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যগুলির অনেকগুলিই অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল, তবুও সংক্ষেপে বলা চলে যে গান্ধীজী পরিচালিত আন্দোলনগুলি সফল হয়েছিল কারণ এ ধরনের আন্দোলন থেকে যে ধরনের ফল আশা করা যেতে পারে তা লাভ করা গিয়েছিল।

কী ধরনের ফল আমরা আশা করতে পারি?

আন্দোলনগুলি প্রকৃতিগতভাবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম নয়। কারণ ওই সব আন্দোলনের গভীরতা, চারিত্রিক গঠন, উদ্দেশ্য, কী ধরনের জনসাধারণ যোগ দিল তার বিচারে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর ফলশ্রুতি আর পাঁচটা ঘটনার মতই সাধারণ ঘটনা।

আন্দোলনগুলির বিশিষ্ট কর্মধারা ছিল নিম্নরূপ:

ক. তারা একটি সরকারপুষ্ট অব্যবস্থার মুখোশ খুলে দিয়েছেন। বলেছেন সরকার যখন নীল চাষীদের দুঃখদুর্দশা খতিয়ে দেখবার জন্য একটা অনুসন্ধান কমিটি করতেও রাজী নয় তখন কী করে বিশ্বাস করা যেতে পারে যে সেই সরকার জনসাধারণের স্বার্থ সম্বন্ধে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট?

খ. তারা জনসাধারণকে উপলব্ধি করাতে চেয়েছেন যে দেশের শাসকদের তারা যতটা শক্তিশালী মনে করে ততটা শক্তিশালী তারা নয়, পক্ষান্তরে জনগণ নিজেদের যতটা শক্তিশালী মনে করে তার তুলনায় তারা অনেক বেশি শক্তিধর। তাই গান্ধীজী ও সর্দার প্যাটেল খেড়ার মানুষদের ডেকে বললেন—'আপনারা যদি খাজনা দেওয়া বন্ধ করেন তবে কালেকটর এসে আপনাদের জায়গা জমি ক্রোক করে নেবে, নীলামে তুলবে এ কথা সত্যি, কিন্তু কেউ যদি নীলামে সাড়া না দেয়, তবে সে কী করবে? পরের বার কালেকটরমশাই এলে তাকে বলবেন আপনার জমিজায়গা যেন পকেটে পুরে ইংল্যানডে নিয়ে যায়।' জনসাধারণ চকিতে সচেতন হয়ে উঠে বুঝতে পারে বক্তার বক্তব্য যুক্তিপূর্ণ—আমরা যদি সংঘবদ্ধ হতে পারি তাহলে শাসনকর্তা কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।

গ. তারা দেশের মানুষের মনে এই ধারণা জাগিয়ে তুলতে পারলেন যে দেশবাসী প্রত্যেকেই শাসনকর্তাদের সাহায্য করে যাচ্ছে। তারা প্রচলিত চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হলেন—সমাজে মূল্যায়ন নতুন করে করলেন। এটা সত্যি কথা যে, ১৯২০-২১ সালে ৫,১৮৬ জনের মধ্যে ৬১ জন মাত্র তাদের উপাধি আর পদক বর্জন করেছিলেন, কিন্তু তখন থেকেই সরকারি উপাধি লজ্জার প্রতীক হল, হল সরকারের তাঁবেদারীর সাক্ষ্য, পক্ষান্তরে যে কোন সত্যাগ্রহে কারাবরণ হল সম্মানের কাজ।

বর্তমান ভারতবর্ষে গান্ধীজীর মত বিরাট নেতৃত্বের অভাব সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এই ধরনের আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে এবং সেইসব আন্দোলনের উদ্দেশ্য পূর্বোল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলিরই সমতুল।

১. আমরা জনতা নেতাদের গতিপ্রকৃতির দিকে তাকালে ১৯৭৩-৭৪ সালের আন্দোলন সম্বন্ধে হতাশ হই—গুজরাটের ও বিহারের ছাত্র আন্দোলন' এবং জে পি নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আন্দোলন আমাদের নিরাশ করেছে সত্যি কথা—তবে এই আন্দোলন কি শাসকশ্রেণীর মুখোশ খুলে দেয়নি—

শাসকগোষ্ঠীর সমস্ত কার্যকলাপ কি জনগণের চোখের সামনে তুলে ধরেনি ?

১. এইসব আন্দোলন বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোর বাইরে থেকে একের পর এক সংঘটিত হচ্ছে। বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামো রোগাক্রান্ত এবং সেদিকে তাকিয়ে আমরা হতাশ হচ্ছি। কিন্তু ১৯৭৩-৭৪ সালের আন্দোলন, বর্তমানের আসাম আন্দোলন উল্লিখিত রোগগ্রস্ত রাজনৈতিক কাঠামোর বাইরে থেকেই পরিচালিত হয়েছে এবং আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে রুগ্ন রাজনৈতিক দলগুলির যে চেহারা আমরা দেখি দেশের সেগুলিই একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন নয়—একটি নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্বে একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি (চেতনা) ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে।

৩. যে ছাত্ররা ইদানীংকালের আসাম আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে, তাদের নাম ক'জনই বা বলতে পারবে ? কিন্তু তারা কি আমাদের মানুষদের কাছে তথা দেশবাসীর মনে একটা ভাবনা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়নি যা নিয়ে আজ দেশের সমগ্র নেতারা প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলীয় সংগঠনে ভাবতে আরম্ভ করেছে যে, এই আন্দোলন আজ দেশের মরণ-বাঁচন প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত।

আন্দোলনের অব্যবহিত উদ্দেশ্যের মূলেই যে ভুল নিহিত আছে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে—১৯৭৩-৭৪-এর আন্দোলনের দাবি ছিল যে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে চিমনভাই প্যাটেলকে এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে আবদুল গফুরকে অপসারিত করতে হবে আর এমন একটা ভাবনার সৃষ্টি করা হয়েছিল যে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে ইতিহাসের একটা অধ্যায় সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয় ভুল হল একটা-দুটো আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পারিপার্শ্বিকতায় পরিবর্তন আনা যাবে, এরকম একটা সিদ্ধান্ত।

বর্তমানে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যে পরিবর্তন এসেছে তার মূলে আছে হাজার হাজার মানুষের প্রতিদিনের ব্যক্তিগত কৃতকর্মের সমাহার। অধিক সংখ্যক মানুষের মন যতদিন না পরিবর্তিত হয় তারা যতদিন পর্যন্ত না অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে ততদিন বিপ্লব বা পরিবর্তন আসতে পারে না। আর সে অবস্থা আসতে প্রয়োজন অনেক দীর্ঘ সময়ের। শাসকশ্রেণী কিন্তু একটি উপায়ে দেশে পরিবর্তন আনতে পারেন। তা হল তাদের নিজেদের আচার-আচরণের পরিবর্তন করে, কিন্তু সমবেতভাবে তা তারা এখনই করছেন না। কাজেই শাসকদলের পক্ষে পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন বন্ধ করা তো দূরের কথা, আন্দোলন কমিয়ে রাখতেও তারা একেবারেই অক্ষম। এই আন্দোলনের একটি বৈশিষ্ট্যসূচক, অত্যন্ত ছোট অথচ যুক্তিপূর্ণ দাবি হল তাদের মধ্যে জনসাধারণের কাছে সবচেয়ে ভ্রষ্ট চরিত্র বলে যে কুখ্যাত তাকে দলথেকে অপসারণ করা। তা যদি তারা না মেনে নেয় তবে বুঝতে হবে তারা অনমনীয় ও যুক্তিবিরোধী।

ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা

'আমাদের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করতে, সঠিক পথ নির্দেশ করতে আমাদের কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হবার উদ্দীপনা সঞ্চার করতে গান্ধীজীর মত কেউ যদি আজ আমাদের থাকতেন'—এ ধরনের বিলাপের কোন অর্থই হয় না। বীর নেতার অবদান অবশ্যই স্মরণীয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী মানুষদের একত্রিত করে সঠিক পথে স্থির লক্ষ্যে পরিচালিত করে তিনি জনসাধারণের মনকে যেভাবে উজ্জীবিত করেছিলেন তা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে একথা ঠিক যে নেতা তার একক চেষ্টায় পূর্বোক্ত সুযোগ অবস্থা এবং আন্দোলন গড়ে তোলেননি।

১৯২০-২১ সালের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে গান্ধীজী মাত্র পাঁচটি বছর ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের জন্য তিনি যে ডাক দিয়েছিলেন তা জনসাধারণের মনে যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু পরবর্তী দশকে জনমানসে সমান শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও ১৯৩১ সালে যখন ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন আবার চালু করতে চাইলেন তখন কিন্তু সে আন্দোলনে কোন গতি এল না।

১৯৭২ সালে জে পি সম্বন্ধে কোন লোকের মত জানতে চাইলে তিনি তাঁকে হ্যামলেটের মত একজন চিরকালের ব্যর্থ নেতা বলেই মন্তব্য করতেন, কিন্তু চার বছর পরের সেই শক্তিহীন পঙ্গু জে পিই হয়ে উঠলেন দেশবাসীর মুক্তি আন্দোলনের প্রতিমূর্ত প্রধান পুরুষ। তাই প্রয়োজনে আমাদের যে গান্ধীদের আবির্ভাব ঘটবে না এ হা-হুতাশ অর্থহীন।

বীরের বৈশিষ্ট্য অনেক কিন্তু বিশেষ যে বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে তা হল সমাজের ঘুণ ধরা যে স্তরের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম সেই স্তর থেকে তার আবির্ভাব ঘটে না। সে আসে সমাজের সম্পূর্ণ এক ভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন অংশ থেকে।

ভারতীয় রাজনীতিবিদরা যে ঐতিহ্য অনুসরণ করে আসছিল তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কৃষ্টির পরিবেশ থেকে এলেন গান্ধীজী। তাই তাঁর কাছে জীবনের মূল্যবোধ, আন্দোলনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি এবং কর্মধারা ছিল ভিন্ন ধরনের, এইসব বাস্তবানুগ কর্মসূচীর কারণেই তার প্রচেষ্টা কার্যকর হয়ে উঠতে পেরেছিল।

অনুরূপভাবে বর্তমান রাজনৈতিক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ ভিন্নতর মূল্যবোধের অধিকারী ছিলেন বলেই ১৯৭৩-৭৫ সালে জে পি-র মত ব্যক্তিত্বকে আয়ত্তে আনতে শ্রীমতী গান্ধীর মত রাজনীতি-জ্ঞানসম্পন্না নেত্রীকেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীর জাঁদরেল অনুগামীরাও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। কোন উঁচুপদের লোভ দেখিয়ে তাঁকে প্রলোভিত করা যায়নি। তাঁর নামে কলঙ্ক আরোপের চেষ্টাও করা হয়েছে, কিন্তু কোন অপবাদই ধোপে টেকেনি।

আমরা দেখেছি জীবনশক্তি দিয়ে আগামী দিনের নতুন সমাজ গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে যে সব দল বা আন্দোলন আগামী দিনের 'নয়া জমানা' গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন তাদের সংঘবদ্ধ করলেই হবে না, অনাগত ভবিষ্যতের বীর নেতারা যে পরিবেশ থেকে আবির্ভূত হবেন সেই পরিবেশকে গড়ে তোলে বলেই প্রান্তসীমার মানুষরা সমাজের পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় এই পর্যায়ের লোকেরা বর্তমান সংস্কৃতির তথাকথিত সমৃদ্ধির জালে নিজেদের জড়িয়ে পড়তে দেয়নি—এরা হল সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন দলের লোক—তাই বীর নায়ক এদের মধ্য থেকেই জন্ম নেয়।

প্রান্তসীমার মানুষদের ব্যাপারে আমরা ইতিমধ্যেই দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করছি আজকের ভারতবর্ষে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি স্তরে তাদের দেখা মেলে এবং দ্বিতীয়ত সামাজিক অবক্ষয় যত বাড়তে থাকে তাদের সংখ্যা তত বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান সময়ে বিরাট কোন 'কেন্দ্রীয় দাবি' অথবা তার চেয়ে কিছুটা কম জোরাল দাবি আদায়ের সুযোগ উপস্থিত হয়নি বলে প্রান্তসীমার মানুষদের অপেক্ষা করে থাকাটা ঠিক হবে না। চম্পারণ ছিল নেপাল সীমান্তের একটা ছোট জেলা, আর নীল ছিল সেখানকার একটা নগণ্য কৃষিজাত পণ্য। বরদলৈর জমির খাজনা পুনর্নির্ধারণ বিষয়ক একটা সংশোধনী, খেড়ায় খাজনা মকুব, কিংবা লবণের উপর সামান্য কর বসান এর কোনটাই কিন্তু দুনিয়া কাঁপানো বিষয় নয়, গান্ধীজী নিজে যে উদ্দেশ্য নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার তুলনায় এই বিষয়গুলির কোনটাই তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়—রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবির মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা বিকল্প সংস্কৃতি ক্রমশ রূপ পরিগ্রহ করছিল।

আজকাল অধিকাংশ নাগরিকই তাদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন বিষয় না হলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে রাজী হয় না। কিন্তু ছোটখাট এমন অনেক আন্দোলন আছে যা দেশকে বিশেষভাবে সজাগ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। আজ সারা দেশের চারিদিকের সমাজের কল্যাণের জন্যই কয়েকটি সাবধানবাণী ছড়িয়ে দেবার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে—দেশকে জানাতে হবে যে আরও উন্নততর জগৎ আছে, আছে জীবনধারণের সুখকর পরিবেশ এবং এমন অনেক মানুষ আছেন যারা বিশ্ববাসীকে উপলব্ধি করাতে, উন্নততর পরিবেশকে স্থায়ী রূপ দিতে সব রকম দুঃখভোগের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। বিপদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য তারা সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন। অবশ্য একটা কেন্দ্রীয় মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রেখে, শুধু লক্ষ্যে পৌঁছবার সুস্থ স্বাভাবিক পথ-নির্দেশ করালেই চলবে না, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা কিছু করার ক্ষমতা যে রয়েছে সে ব্যাপারে একেবারে নিঃসন্দেহে হতে হবে। অন্তত সেরকম একটা উপলব্ধি জাগাতে হবে। এই মানসিকতার কথা সলঝেনিৎসিন তাঁর 'দি ওক অ্যানড দি কাফ' বইতে অত্যন্ত মুন্সীয়ানার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে গেছেন : 'যখন কথার জোরেই একটা জড়পদার্থকে স্থানচ্যুত করা দরকার তখন কাজটা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। আর তোমার হাতের কাছে যদি পার্থিব শক্তি পাওয়া না যায় যার সাহায্যে তুমি কাজটি হাসিল করতে পার তখন ঐ চেষ্টা ছাড়া আর উপায়টাই বা কি ? একটা কথা প্রচলিত আছে যে, পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে জোরে চিৎকার করলে জমা বরফ গলে গিয়ে হিমবাহের সৃষ্টি হয়, সেইরকম.....।' □

আমেদাবাদে দারু স্মৃতি বক্তৃতামালা 'রিজনস ফর হোপ' থেকে লেখকের অনুমতিক্রমে অনূদিত ও প্রকাশিত। কিছু কিছু অপ্রাসঙ্গিক অংশ বর্জন করা হয়েছে।

অনুবাদ : দিব্যজ্যোতি বসু

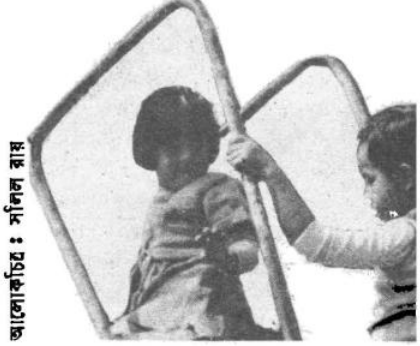

আলোকচিত্র : সলিল রায়

পৃথিবীর সদ্যস্বাধীন দেশগুলি অধিকাংশই দরিদ্র। গণতন্ত্রের স্বাদ থেকেও তারা বঞ্চিত। ভারত তার জন্মের সময় থেকেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করা সত্ত্বেও আপামর মানুষের অসচেতন সামাজিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ সেই পঁয়ত্রিশ বছর ধরে লালিত গণতন্ত্রের ওপর আঘাত হানছে। লেখক বিদেশে অধ্যাপনা করতে গিয়ে সেখানকার মানুষের গণতন্ত্রচেতনার সঙ্গে আমাদের গণতন্ত্রচেতনা মিলিয়ে দেখেছেন এ লেখায়।

ভারতীয় গণতন্ত্র ও মূর্খ কালিদাস

ডঃ নিমাইসাধন বসু

প্রায় পনের বছর আগের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সবে প্রকাশিত হয়েছে। অবিভক্ত কংগ্রেসের বহু রথী-মহারথী লোকসভার নির্বাচনে হেরে গেছেন। আমি তখন আমেরিকার হার্ভারড বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সামনে একজন অপরিচিত আফ্রিকান ছাত্র হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে আমার হাত ধরে অভিনন্দন জানাল। বললে 'ভারতবর্ষে আপনারা ব্যালট বকস-এর মাধ্যমে যেভাবে বড় বড় নেতাদের সরাতে পারলেন তার কোনও তুলনা নেই। আমরা যদি এই সুযোগ পেতাম তাহলে আমাদের অপদার্থ বহু নেতাকে সরাতাম। দেশ বেঁচে যেত, অনেক উন্নতি হত।'

বিদেশে ভারতীয় গণতন্ত্রের ঐরকম প্রশংসা শুনে গর্বিতবোধ করেছিলাম। ঠিক দশ বছর পরে ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর দলের পরাজয়ের পর দেশে বিদেশে ভারতীয় গণতন্ত্রের ব্যাপক প্রশংসা হয়েছিল। অনুরূপভাবে ১৯৮০ সালের নির্বাচনে ব্যালট বকস-এর মাধ্যমেই শ্রীমতী গান্ধীর সগৌরবে প্রত্যাবর্তন আর একবার প্রমাণ করেছিল যে ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত কতটা গভীর ও সুদৃঢ়।

বর্তমান বিশ্বে ভারতবর্ষের ভাবমূর্তি খুব উজ্জ্বল নয়। নানান কারণে বিশ্বের প্রথম সারির প্রগতিশীল উন্নত দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান নেই। আফ্রো-এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে জাপান ও চীন ছাড়া অন্য কোনও দেশেরই তেমন মর্যাদা নেই। কিন্তু বিশ্বের স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে ভারতের এক অনন্য স্থান আছে। এর ফলে আমরা কিছুটা আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগছি। কিন্তু আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে কিভাবে এই গণতন্ত্রের ভিত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমরা নিজেরা এর জন্য কতটা দায়ী সে চিন্তা করছি না। এই আলোচনার পূর্বে ঐতিহাসিক পটভূমি ও তার তাৎপর্যের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীন ভারতবর্ষের নতুন সংবিধান অনুসারে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কার্যকর হয়। কিন্তু কেন ঐ দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল তা অনেকেই জানেন না বা বিস্মৃত হয়েছেন। অথচ ঐতিহ্যচেতনা না থাকলে দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতিবোধ শিথিল হবার আশঙ্কা থাকে। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি দিনটি 'পূর্ণস্বরাজ' বা 'স্বাধীনতা দিবস'রূপে উদযাপিত হয়েছিল। ঐ দিন লক্ষ লক্ষ স্বদেশপ্রেমিক ভারতবাসী 'স্বাধীনতার শপথ' গ্রহণ করেছিল। ঐ 'শপথ' বা প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাধীনতাকে ভারতীয়দের 'অবিচ্ছেদ্য অধিকার' (inalienable right) রূপে বর্ণনা করে ভারতবর্ষে বৃটিশ শোষণের তীব্র নিন্দা করা হয়। তার অল্পদিনের মধ্যে শুরু হয় ঐতিহাসিক আইন অমান্য আন্দোলন। ২৬ জানুয়ারি ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক বিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ দিন।

> আমরা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে কিভাবে এই গণতন্ত্রের ভিত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমরা নিজেরা এর জন্য কতটা দায়ী সে চিন্তা করছি না।

বিশ বছর পরের ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসেরই নয় বিশ্বের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। এটা কোনও আবেগ ও দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি নয়। ঐতিহাসিক সত্য। এই সত্য এবং তার অসীম গুরুত্ব যদি ভারতীয়রা উপলব্ধি না করে, তার স্বীকৃতি না দেয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের চরম মূল্য দিতে হবে। ১৯৪৫ সালে সানফ্রানসিসকো শহরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations) সনদে স্বাক্ষর করেছিল ৫০টি দেশ। ভারতবর্ষ তখনও স্বাধীন হয়নি। আর বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মোট সদস্যসংখ্যা হল প্রায় ১৫০। অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে প্রায় ১০০টি দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে।

> সর্বপ্রথম ও প্রধান কথা হল যে আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ও সোচ্চার হলেও নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

এই দেশগুলির মধ্যে অধিকাংশ হল এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের এবং তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের। কিন্তু এই প্রায় ১০০টি দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, ন্যূনতম মানব অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুন্ন আছে এমন দেশের সংখ্যা খুবই কম। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ (ভোটার সংখ্যার বিচারে) ভারতবর্ষ তার অন্যতম। ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও বৈষম্য, সামাজিক দুর্বলতা ও বৈষম্য এবং ব্যাপক দারিদ্র্য সত্ত্বেও এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের মূল্য কত অপরিসীম তা আমরা নিজেরা বিস্মৃত হই। কখনও কখনও 'আজাদী ঝুটা হ্যায়' বা 'এই স্বাধীনতা মিথ্যা' স্লোগান এখনও পথে ঘাটে শোনা গেলেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতালাভের গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পৃথিবীতে কতখানি মূল্যবান তা প্রতিফলিত হয়েছিল যখন শ্রীমতী গান্ধী জরুরীব্যবস্থা চালু করেছিলেন। পরের দিনই অ্যামনেসটি ইনটারন্যাশনাল গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে শ্রীমতী গান্ধীর কাছে প্রেরিত এক বার্তায় বলে যে এই ব্যবস্থা ভারতবর্ষের দীর্ঘ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের বিরোধী। ১৯৭৫-৭৬ সালের বার্ষিক রিপোরটে অ্যামনেসটি ইনটারন্যাশনাল ভারতবর্ষের জরুরী ব্যবস্থার প্রবর্তনকে সমগ্র এশিয়ায় মানবিক অধিকার ক্ষুন্ন করার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়।

ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়ার প্রধান কারণ হল যে, কোন জিনিসের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখা দিতে বাধ্য। দুঃখ ও উদ্বেগের কথা হল যে সেই ঔদাসীন্যের ও অবহেলার লক্ষণ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিদেশে বহুলোক প্রশ্ন করেছে ভারতবর্ষের মত দরিদ্র ও ব্যাপক নিরক্ষরতার দেশে গণতন্ত্র বেঁচে থাকা সম্ভব কিনা। ভারত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, ভারতে যাতায়াত আছে বা স্বল্পকালের জন্য এদেশে এসেছেন এমন অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, যেভাবে এদেশের শাসনব্যবস্থা চলেছে, সমস্যা বাড়ছে, সেভাবে চললে গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় থাকা সম্ভব নয়।

বিদেশিদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমাদের দেশেও বহুলোক ভাবতে শুরু করেছে যে, একনায়কত্ব, স্বৈরতান্ত্রিক শাসন বা সামরিক শাসন ছাড়া আর বোধহয় কোনও পথ খোলা নেই। সবরকম রাজনৈতিক মতাদর্শ ও রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ও শ্রদ্ধা কমে যাচ্ছে। স্বৈরতন্ত্র বা সামরিক শাসন যে কত ভয়াবহ হতে পারে তার পরিণাম কী এবং একবার গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা লুপ্ত হলে তা পুনরুদ্ধার করা কতখানি দুরূহ সে বিষয়ে ধ্যান-ধারণা কম বলেই এই জাতীয় চিন্তা আমরা মনে মনে প্রশ্রয় দিচ্ছি।

খুব সহজেই গণতান্ত্রিক অধিকার আমরা পেয়ে গেছি বলে তার মূল্য সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই। আমরা গভীরভাবে চিন্তা পর্যন্ত করি না কেন ও কিভাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবক্ষয় ঘটছে ও আমাদের করণীয় কিছু আছে কি না। অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে, বিদেশের সঙ্গে তুলনায় আমাদের দৈন্য বা দোষ কোথায়। কেন আমরা জীবনের সকলক্ষেত্রে এত সমস্যায় ও ব্যর্থতায় জর্জরিত হচ্ছি। স্বল্প পরিসরেও এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের কয়েকটি দিকের কথা তুলে ধরা যায়।

সর্বপ্রথম ও প্রধান কথা হল যে আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ও সোচ্চার হলেও নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। কেউ যদি তা স্মরণ করিয়ে দেয় তাহলে আমরা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হই। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় আমরা দিচ্ছি তা পাশ্চাত্যের দেশগুলির মানুষ কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না। বড় বড় দৃষ্টান্ত বা তত্ত্বকথার প্রয়োজন নেই। নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের অসংখ্য দৃষ্টান্তের দু-একটি দিলেই হবে।

বিদেশে ব্যাংক যদি সকাল ১০টায় খোলার সময় হয় তাহলে ১০টা বেজে এক মিনিট হবার উপায় নেই। স্কুল যদি সকাল আটটায় শুরু হবার কথা হয় কনকনে ঠাণ্ডায় বরফের মধ্যেও আটটাতেই শুরু হয়। যে কোন সরকারি বা বেসরকারি অফিস বা প্রতিষ্ঠান ঘাড়ির কাঁটা ধরে খোলে ও বন্ধ হয় এবং নিয়মমত কাজ হয়। কোনও কাজ করানর জন্য সুপারিশ করতে হয় না বা জানাশোনা লোককে 'ধরতে' হয় না। এর জন্য কোনও সরকারি 'নির্দেশ', বিশেষ 'আবেদন' বা 'ভীতি প্রদর্শনের' প্রয়োজন হয় না। নিজের কর্তব্যপালন বিদেশের মানুষের মজ্জাগত হয়ে গেছে। অভ্যাস হয়ে গেছে। আমাদের দেশে যারা এই রকম অভ্যাস অর্জন করেছে তাদের সংখ্যা নগণ্য। আমরা তাদের বোকা বা নির্বোধ বা অস্বাভাবিক মনে করি। ব্যাংকের কর্মচারী যখন কোনও সরকারি অফিসে গিয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেন তখন রেগে অগ্নিশর্মা হন। অব্যবস্থা অবহেলার নিন্দায় মুখর হন। তখন ভুলে যান যে, তার ব্যাংকের কাউনটারে কাজ উদ্ধার করতে ঐ সরকারি কর্মচারীর একই অভিজ্ঞতা হয়। নিজের অধিকার, সময়ের মূল্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে এত সচেতন এবং

> পৃথিবীর সব দেশেরই জনজীবনে ও রাজনীতিতে কিছু কিছু দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও স্বার্থপরতা আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে রাজনীতি ও জনজীবনে দুর্নীতি যেমন ব্যাপক ও গভীরভাবে প্রবেশ করেছে তার তুলনা নেই।

অন্যের অধিকার, সময়ের মূল্য ও আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ মানুষ আমাদের দেশে যত আছে তা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই।

আমি নিজে শিক্ষক তাই শিক্ষকদের একটা দৃষ্টান্ত দিই। বিদেশে যখন শিক্ষকতা করেছি দেখেছি যে পরীক্ষার সাতদিনের মধ্যে (কোনও কোনও ক্ষেত্রে তিনদিনের মধ্যে) পরীক্ষককে খাতা দেখে নমবর জমা দিতে হয়। এর ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। এখানের অভিজ্ঞতার কথা সকলেরই জানা আছে। অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

গণতন্ত্রের এক প্রধান ভিত্তি হল 'Rule of Law' এবং 'Legal Equality' অর্থাৎ আইনের শাসন ও আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমান অধিকার। ভারতবর্ষে আইনগত ও নীতিগতভাবে এই ব্যবস্থা গৃহীত হলেও ছোট বড় বহু ক্ষেত্রে তা কার্যকর হয় না। ভারতীয় সুপরিম কোরট ও রাজ্য হাই-কোরটগুলির জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভূমিকা দেশে-বিদেশে বিশেষ প্রশংসিত হয়েছে। বহু ব্যবহারজীবীও এই বিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন। তবুও নানান কারণে সামগ্রিকভাবে আদালতে সুবিচার লাভ, প্রকৃত দোষীর শাস্তিবিধান ও অন্যায়ের প্রতিকার সম্বন্ধে আস্থার অভাব রয়েছে এবং এই অনাস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জন-সাধারণের মনে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে প্রচুর অর্থব্যয় এবং 'সুপারিশ' বা 'মুরুব্বির জোর' না থাকলে সব সময় সুবিচার হয় না বা যে কোনও অন্যায় করে অব্যাহতি পাওয়া যায়। বিদেশে কিন্তু বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই ধরনের ব্যাপক ও গভীর অনাস্থার মনোভাব নেই। যে যতই উচ্চপদাসীন হোক না কেন আইনকে ভয় করে। কিছুদিন আগে ইংলনডের রাণীর জামাতা ট্রাফিক আইনভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে জরিমানা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেনট কারটারের নিজের ভাগ্নে দোষী সাব্যস্ত হয়ে দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করছে। বহু সেনেটের ও কংগ্রেস সদস্যের নিকট আত্মীয়-আত্মীয়া আইনের হাত থেকে অব্যাহতি পায়নি। পুলিশের কাছ থেকে কোনও সুযোগ-সুবিধা পায়নি বা পায় না। আমাদের দেশে অনেক ছোট মাপের নেতা বা বিত্তশালী, প্রভাবশালী লোকের আত্মীয় ও আশ্রিতরা প্রকাশ্যে সদর্পে আইন ও পুলিশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই পরিস্থিতি অকল্পনীয়।

রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি-স্তম্ভ হল প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন। একটি ব্যক্তির একটি ভোট হল এই ব্যবস্থার মূল কথা। ভারতবর্ষে এখন এর সঙ্গে কয়েকটি বিশেষণ যুক্ত হয়েছে। 'অবাধ, ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ' নির্বাচন (Free, fair and peaceful election)। এই বিশেষণগুলি আমাদের গণতন্ত্রের অসুস্থতা প্রমাণ করেছে। অর্থাৎ আমরা প্রকাশ্যেই স্বীকার করছি যে, সব নির্বাচন 'অবাধ, ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ' হয় না।

বিদেশে এই ধরনের চিন্তা পর্যন্ত করা যায় না।

পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা খুবই কম। কোন কোন দেশে, যথা—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, পশ্চিম জারমানি ইত্যাদি, প্রকৃতপক্ষে দুটি প্রধান দলের

HES G. 6. BN-(R)

ব্যাংকের কর্মচারী যখন কোন সরকারি অফিসে গিয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেন তখন রেগে অগ্নিশর্মা হন। অব্যবস্থা অবহেলার নিন্দায় মুখর হন। তখন ভুলে যান যে তাঁর ব্যাংকের কাউনটারে কাজ উদ্ধার করতে এ সরকারি কর্মচারীর একই অভিজ্ঞতা হয়।

মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ থাকে। অন্যান্য ছোট দলগুলির সংখ্যা কম যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা গঠনে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ভারতবর্ষে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র দল ও উপদলের সংখ্যার শেষ নেই। আজ পর্যন্ত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেসের কোন বিকল্প দল গড়ে ওঠেনি। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙনের ফলে একাধিক কংগ্রেস দলের সৃষ্টি হলেও প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে সর্বভারতীয় কংগ্রেস দল বলতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস দলকেই বোঝায়। জনতা দলের উদ্ভব মত উদয় ও পতন কংগ্রেসের বিকল্প দল গঠনের ব্যর্থতার প্রমাণ মাত্র। সি পি আই (এম) এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অন্য দু-একটি রাজ্যে শক্তিশালী। অন্যান্য রাজ্যে আঞ্চলিক দল আছে মাত্র। প্রাপ্ত ভোটের বিচারে জনতা, বি জে পি, সি পি আই বা লোকদল সর্বভারতীয় দলের মর্যাদার অধিকার লাভ করেনি। ভাষা, ধর্ম ও আঞ্চলিক স্বার্থের প্রশ্নে গঠিত দলগুলি এবং নির্বাচনী যুদ্ধ জাতীয় স্বার্থ ও গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় 'লনডন টাইমস' কাগজের প্রতিবেদক লিখেছিলেন যে, ভারতবর্ষে সংসদীয় ব্যবস্থা দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় পার্থক্য ও বিরোধকে তীব্রতর করে তুলছে। এই মন্তব্য আপত্তিজনক ও সামগ্রিকভাবে যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কিন্তু সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। এর কি প্রতিকার করা যায় তা ভাববার সময় এসেছে। বিশেষ করে দলত্যাগ করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য নতুন উপদল গঠন সংক্রামক ব্যাধির মত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিদেশে এই দলত্যাগ ও উপদল গঠনের সমস্যা নেই। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম জারমানির সংসদীয় ব্যবস্থার একটি নিয়মের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। পশ্চিম জারমানির সংবিধানের নিয়ম হল যে, সাধারণ নির্বাচনে কোন দল যদি মোট প্রদত্ত ভোটের ৫% না পায় তাহলে ঐ দল কোন প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার পাবে না। এইরকম আইন থাকলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদল গঠন বা সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠী গঠন ও দলত্যাগ করে দল গঠনের পথ বন্ধ করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষে প্রকৃত সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি গড়ে ওঠার আর এক প্রবল অন্তরায় হল সর্বগ্রাসী দলীয় রাজনীতির প্রসার। পাশ্চাত্যে রাজনৈতিক দলগুলির কর্মতৎপরতার অলিখিত সীমানা আছে। কিছু কিছু ক্ষেত্র ও বিষয় আছে যেখানে দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে না। কিন্তু আমাদের দেশে এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যা রাজনীতিমুক্ত। দলীয় স্বার্থচিন্তামুক্ত। এর ফলে সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি অসুস্থ কলুষিত হয়ে পড়ে। গণতন্ত্র বা সুস্থ রাজনীতির পক্ষে এই অবস্থা বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষক, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষক, বিভিন্ন সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের

পাশ্চাত্যে রাজনৈতিক দলগুলির কর্মতৎপরতার অলিখিত সীমানা আছে। কিছু কিছু ক্ষেত্র ও বিষয় আছে যেখানে দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে না। কিন্তু আমাদের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যা রাজনীতিমুক্ত।

করণিক, মধ্য ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী থেকে শুরু করে উপাচার্য ও সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলপদে নিয়োগের সময় বহু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মত ও আনুগত্যের কথা বিবেচনা করা হয়।

পৃথিবীর সবদেশেরই জনজীবনে ও রাজনীতিতে কিছু কিছু দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও স্বার্থপরতা আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে রাজনীতি ও জনজীবনে দুর্নীতি যেমন ব্যাপক ও গভীরভাবে প্রবেশ করেছে তার তুলনা নেই। দুর্নীতিকে আমরা জনজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছি। তারই ফলে আমরা প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছি যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দুর্নীতি অপরিহার্য।

গণতন্ত্র ও দুর্নীতির এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মানুষ মেনে নেয় না। Asia Awakes গ্রন্থে ডিক উইলসন লিখেছেন যে ভারতের সর্বত্র একটা অবিশ্বাস এবং রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগ আশঙ্কার ভাব রয়েছে। দুর্নীতি, দেশাত্মবোধের অভাব ও জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের অভাব সার্বিক নীতিবোধের অপরিণত নিম্নমানের পরিচয় দেয়। এই অপ্রিয় কঠোর মন্তব্য আমাদের ক্ষুব্ধ করলেও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয়।

ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের দুর্বলতা এবং তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে দেশে বিদেশে একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়। সেটি হল যে ভারতীয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল দেশের দুই-তৃতীয়াংশ লোক অশিক্ষিত। তারা গণতন্ত্র বোঝে না, সংসদীয় ব্যবস্থার মূল্য জানে না। এর থেকে বড় কোনও ভুল ব্যাখ্যা বা যুক্তি আমার জানা নেই। স্বাক্ষর জ্ঞান নেই বলেই ভারতের অধিকাংশ মানুষ 'অশিক্ষিত' এই বক্তব্য আমি মানি না। স্বাক্ষর জ্ঞান ও শিক্ষা এক নয়। ভারতবর্ষের সাধারণ তথাকথিত 'অশিক্ষিত' মানুষ পাশ্চাত্যের স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের থেকে কোনও অংশে কম শিক্ষিত নয়। পাশ্চাত্যের বহু শিক্ষাবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদও বর্তমানে তা স্বীকার করেন। বর্তমান আলোচনার সীমিত পরিসরে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষের সাধারণ অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষ গভীরভাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকারে বিশ্বাস করেন।

গত তিন দশকের সাধারণ নির্বাচনগুলিতেও অন্যান্য নির্বাচনে তারা যে রাজনৈতিক জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন পাশ্চাত্যের যে কোন দেশের মানুষের রাজনৈতিক জ্ঞানবুদ্ধির থেকে তা কম নয়। সমস্যা সৃষ্টি করেছে শিক্ষিতরা এবং উচ্চ শিক্ষিতরা। তাদের অধিকাংশেরই গণতন্ত্রের প্রতি অন্যের অধিকার ও মর্যাদার প্রতি এবং নিজের দেশের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা বা আনুগত্য নেই।

অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের ইতিহাস, কিভাবে সেখানে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, কেমনভাবে শাসনব্যবস্থা ও জনজীবন পরিচালিত হয় তা তাঁরা খুব ভালভাবেই জানে। কিন্তু ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থান্ধ হয়ে তারা ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সকল সুযোগ গ্রহণ করে অথচ তার নিন্দায় মুখর হয়। নিজের অধিকারের ষোল আনা প্রাপ্তির বিষয়ে তারা তৎপর, দায়িত্বের এক আনা পালনে বিমুখ। অথচ তারা, অর্থাৎ আমরা আশা করছি যে ভারতের গণতন্ত্র, ভারতের মর্যাদা অটুট থাকবে।

'মূর্খ' কালিদাসের মত আমরা যে ডালে বসে আছি সেই ডালই কাটছি। অন্য দেশের মানুষের সেই বোধ আছে। আমাদের নেই। □

দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য

নবম দশম

এবছর যারা দশম শ্রেণীতে পড়ছে তাদের জন্য 'নবম দশম'-এর একটি পৃথক পর্যায় বেরোচ্ছে প্রতি মাসের ৮ ও ২৩ তারিখে। প্রচ্ছদে লেখা থাকছে 'দশম শ্রেণীর জন্য'। গত বছরের মত এবছরেও 'নবমদশম' বুঝিয়ে দিচ্ছে নটি পাঠ্য বিষয়ের পড়া।

২৩ জানুয়ারি সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতের ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর। পণ্ডিত নেহরুর জন্মস্থান এই রাজ্য দেশ বিদেশের মানুষের কাছে সমান আকর্ষণীয়। এই কাশ্মীর নিয়েই শুরু হয়েছিল পাক-ভারত যুদ্ধ। যেমন অতিথিদের কাছে নন্দনীয়, তেমনি রাজনীতিবিদদের বিতর্কিত দেশ কাশ্মীর। এ সংখ্যায় প্রচ্ছদ কাহিনীতে কাশ্মীর নিয়ে মনোজ্ঞ নিবন্ধ।

নদীমাতৃক দেশ ভারতবর্ষ। অসংখ্য নদ-নদীতে ভরা এই দেশ। সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সাবরমতী, মাহী, পেন্নার কত নাম! অসংখ্য নদনদী নিয়ে ধারাবাহিক নিবন্ধ **'করুণার ধারা'**।
লিখছেন **দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।**

স্কুলে পড়তে হয় সবাইকে। যে যত বিখ্যাত হন না কেন, স্কুলের চার দেওয়ালে বন্দী হতে হয়েছে একবার না একবার। কত স্মৃতি ছড়িয়ে থাকে স্কুলজীবনকে ঘিরে। এই মধুর স্মৃতিরই আলাপন **'যখন স্কুলে পড়তাম'**—নিয়মিত বিভাগে। এবারে স্কুলজীবনের স্মৃতিচারণ করেছেন প্রখ্যাত কবি ও সাংবাদিক **সুভাষ মুখোপাধ্যায়।**

এছাড়া বুদ্ধির খেলা, সাম্প্রতিক সংবাদ, এবং জবাব এসব নিয়মিত বিভাগ।

জাপানের আত্মসমর্পণের পর বৃটিশ গুপ্তঘাতক দল 'ডেথ স্কোয়াড' নেতাজীকে হত্যা করেছিল কি ?

KANDY - 17/8 STOP 1510 STOP AZAD HIND GOVT LEADER SHOT DEAD PARAIDES SNCON WHILE MEETING AT BANGKOK HOTEL STOP DETAILS AWAITED EOM

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে ঘিরে যাবতীয় রহস্যের যবনিকা এখনও ওঠেনি। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে তিনি কী করলেন, কোথায় গেলেন, তিনি আদৌ জীবিত কিনা তা নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ওঠে ভারতীয়দের মনে। এমনই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এ লেখায়। প্রতিবেদক তরুণ বয়সে মিত্রশক্তির এক গোয়েন্দা বিভাগে ফরাসি অনুবাদকের কাজ করতেন। নেতাজীর অনেক কার্যকলাপ সেই দপ্তরে একটি পৃথক ফাইলে রক্ষিত হত। ছয় খণ্ডের এই ফাইলটিকে গোয়েন্দাকর্তারা নাম দিয়েছিলেন 'চন্দ্র বোস' ফাইল। ওডেসা ফাইলের মতই অনেক অজানা ও রোমাঞ্চকর তথ্য এখান থেকে পাওয়া গেছে। প্রতিবেদক পরবর্তী-কালে অপসৃত সেই ফাইল অবলম্বন করেই লেখাটি লিখেছেন।

নেতাজী ফাইল

শিবপ্রসাদ চৌধুরী

আজাদ হিন্দ ফৌজের গোড়াপত্তন হল ব্যাংককে। ১৯৪২ সালের ১৫ জুন। এর সর্ববাদীসম্মত চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন রাসবিহারী বসু। সর্বাধিনায়ক হিসাবে নিযুক্ত হলেন ক্যাপটেন মোহন সিং। ভারতের সামরিক বিভাগ থেকে যোগ দিতে এলেন লেফটেনানট করনেল জিলানি, করনেল এন এস গিল এবং মেজর মহাবীর সিং ধীলন। অসামরিক বিভাগ হতে এলেন এন রাঘবন, কে পি কে মেনন, দেবনাথ দাস প্রমুখ। একটি কাউনসিল অব অ্যাকশন বা সংগ্রাম পরিষদও তৈরি হল।

আমি তখন এক সামান্য স্বাধীনতা সংগ্রামী। পুলিশের নজর পড়েছিল আমার ওপর। ফলে ধরা পড়ে যাই। দেশরক্ষা আইনে ধরা পড়লেও আমাকে তারা জেলে রাখতে পারেনি। ছাড়া পাবার পর দিললি চলে যাই। সেখান থেকে চাকরি পাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যানড (এস ই এ সি)-এর সদর দপ্তরে। এই দপ্তর ছিল শ্রীলঙ্কার (তৎকালীন সিংহল) কানডি। দপ্তরটি কিন্তু ভারতে অবস্থিত বৃটিশ শাসনের বাইরে ছিল। এর তত্ত্বাবধায়ক ছিল খোদ বৃটিশ সরকার।

ফরাসি অনুবাদকের কাজ নিয়ে এস ই এ সি বা সিয়াক-এ যাওয়ার ফলে আমার জীবনে এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসে গেল। দিললিতে কাজ করার ফলেই এই দপ্তরের পোলিটিকাল ওয়ার-ফেয়ার ডিভিশনে আমি চলে এলাম। এখানে কাজ করতে করতেই নেতাজীর সঙ্গে আমার এক পরোক্ষ যোগাযোগ ঘটে গেল।

ইংরাজের এই যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রচার বিভাগে আমার কাজ ছিল সামান্যই। শুধু তাদের প্রচারের কায়দাটা লক্ষ্য করতাম। অনেকে বলেন জারমানের গোয়েবলস নাকি প্রচার কাজে দক্ষ কিন্তু সত্যি বলতে কি ইংরাজের প্রচার যন্ত্র ছিল অনেক জোরদার। এই প্রচারযন্ত্র নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধেও লেগেছিল।

সিয়াক প্রতিদিন নেতাজীর প্রদত্ত বেতার বক্তৃতাগুলি মনিটর করত। তাঁর সব গতিবিধিও এখানে লিপিবদ্ধ করা হত। এখান থেকেই প্রচার চালিয়ে আবার জাপানী বাহিনী ও সেই সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ জোরদার করা হত। এমন আক্রমণ চলেছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের কাউনসিল অব অ্যাকশনের বিরুদ্ধে। প্রচারের ফাঁদে পা দিয়ে সেটি একদিন ভেঙে যায়।

জেনারেল উইনগেট কে ?

এই সময় কানডিতে এক ভদ্রলোককে একদিন দেখলাম। চটপটে হাবভাব, একমুখ দাড়ি, শক্তসমর্থ চেহারা, মুখে সব সময় একটা পাইপ। এর নাম জেনারেল উইনগেট। ঐ একদিনই দেখেছিলাম উইনগেটকে। উইনগেট ছিলেন গেরিলা যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ। এ অঞ্চলে মিত্রশক্তির সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ এম আই-টুর কর্তাব্যক্তি ছিলেন তিনি। তার গতি-

১৯৩৩ সালে প্রাগে

বিধির কথা কেউ জানত না।

ব্রহ্মদেশ তখন জাপানের অধীনে এসে গেছে। খবর পেলাম ব্রহ্মের উত্তরাঞ্চলে ভামো নামে একটা জায়গায় প্যারাসুটের সাহায্যে জঙ্গলের মধ্যে অস্ত্র-শস্ত্র ফেলা হচ্ছে। সেখানকার জাপ-বিরোধী গেরিলাদের সাহায্য করাই এর উদ্দেশ্য। ফিনডউইন পাহাড় পেরিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ফেলা এবং গেরিলাদের সঙ্গে যোগাযোগের পুরো দায়িত্ব বর্তেছিল এম আই-টুর উপর। সম্ভবত সে সব তদারক করার জন্যই উইনগেট একদিনের জন্য কান্ডিতে এসেছিলেন। পরে উইনগেটের নামটা আর একবার আমাদের কানে আসে। ১৯৪৪ সালে আমরা শুনলাম 'উত্তর ব্রহ্মের কোন এক জায়গায়' এক মারাত্মক বিমান দুর্ঘটনায় উইনগেটের মৃত্যু হয়েছে।

এই এম আই-টু বা উইনগেটের সঙ্গে নেতাজীর নামটা অনেকখানি জড়িয়ে আছে। পার্ল হারবার আক্রমণ করার পরই দশ মাসের মধ্যে সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জাপানী ফ্যাসিবাদী বুটের তলায় চলে যায়। দেশে দেশে তারা তাঁবেদার সরকার বসাতে থাকে। ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী ইউবামও ছিলেন এরকম একজন। ইউবাম এবং সেই সঙ্গে জাপানী শাসন হটাবার জন্য ব্রহ্মের তৎকালীন প্রগতিশীল নেতারা একটি যুক্ত মোর্চা গঠন করেছিলেন। মোর্চার নাম ছিল অ্যানটি-ফ্যাসিসট পিপলস ফ্রিডম লীগ। এদের নেতা ছিলেন অউংসান। অউংসান নেতাজীর মতই আগে জাপানের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু জাপান নির্লজ্জের মত ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করায় তিনি অবিলম্বে জাপানবিরোধী হয়ে যান। ব্রহ্মের মধ্যেই তখন বিভিন্ন গোষ্ঠী নিয়ে মোর্চা তৈরি করতে থাকেন। যাদের প্রধান শত্রু তখনকার বৃটিশ শাসক নয়, জাপান সরকার।

অউংসানের বৃটিশ বিরোধিতা ছেড়ে মোর্চা গঠনের সংবাদ সিয়াক এবং সে সূত্রে এম আই-টুর কাছে পৌঁছে গেল। তৎপর হল এই গোয়েন্দা সংগঠনটি। তারা যোগাযোগ করল এই মোর্চার সঙ্গে। একটা পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের জন্য যে সব অস্ত্রশস্ত্রের দরকার পড়ে তার সবই বিপুল পরিমাণে জমা হতে থাকল উত্তর ব্রহ্মের কোন এক স্থানে।

সিঙ্গাপুর, মালয়, ব্রহ্মদেশ এবং থাইল্যান্ডের মাটিতে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল ভারতীয় চতুর্দশ সেনা-বাহিনী। বাহিনী ওসব জায়গায় পৌঁছনোর আগেই এম আই-টু পৌঁছে গিয়েছিল এবং ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। জাপানের অগোচরে হয়ে গেল পুরো ব্যাপারটা। এই গোয়েন্দাদের খবরের ভিত্তিতেই জয়েনট এয়ার কম্যানড, রয়েল এয়ার ফোরস, ইনডিয়ান এয়ার ফোরস এবং ইউ এস এ এফ-র জঙ্গী বিমানগুলি জাপ-অধিকৃত সামরিক বিমান ঘাঁটিগুলির উপর অবাধে বোমা বর্ষণ করতে পেরেছিল।

মারকিন জেনারেল স্টিলওয়েল এবং জেনারেল ওয়েডমেয়ার ভারত—ব্রহ্ম সীমান্তে গভীর জঙ্গল এবং ফিনডউইন পর্বতমালার মধ্য দিয়ে চীনের দক্ষিণ প্রান্তের গেরিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের যুদ্ধকালীন রাজধানী চুংকিং-এ যুদ্ধের রসদ পৌঁছে দিতে সক্ষম হলেন। জাপানের বিরুদ্ধে সমরাস্ত্র পৌঁছে দেবার জন্য তারা ঐ দুর্গম পাহাড় ও গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটা সতের শো কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাও বানিয়েছিলেন। এর নাম স্টিলওয়েল রোড।

এই সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর কিছু লোককে পাঠানো হয় ব্রহ্মে। উদ্দেশ্য, সেখানকার জাপবিরোধী গেরিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। এই সময়েই আজাদ হিন্দ বাহিনীর একটা অংশও ব্রহ্মে ঢোকার চেষ্টা করছিল। নেতাজী তখনও সেখানে আসেননি। করনেল গিলের উদ্যোগে দুটি ছোট স্কাউট বাহিনী ভারতের পথে রওনা হল। সিয়াকে বসেই আমরা এ খবর পেলাম। কেমন করে পেলাম সে কথাই এখন বলি।

চন্দ্র বোস ফাইল

সিয়াকে কাজ করার সময় হঠাৎ আমার নজরে এল পোলিটিক্যাল ওয়ারফেয়ার ডিভিশনে একটা গোপন ফাইল রয়েছে। তার নাম 'চন্দ্র বোস' ফাইল। ফাইলটি খুব গোপনে আমি পড়ে দেখলাম। তারপর থেকেই নেতাজী সম্পর্কে আমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। এর গোড়াতেই এক জায়গায় লেখা রয়েছে 'A man of outstanding organising ability Mr. Bose is a dangerous politician that cannot be found in the whole gamut of congress leadership. Haughty and arrogant to the extreme he knows no compromise...'

পোলিটিক্যাল ওয়ারফেয়ার ডিভিশনে আমার বস্ ছিলেন মিসেস বিয়েট্রিস-গ্রে। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি সে স্নেহের সুযোগ নিয়েছিলাম। যখনই সুযোগ বুঝতাম তখনই ফাইলটা খুলে দেখার ও পড়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এ কাজটা আমাকে করতে হত অত্যন্ত গোপনে এবং সতর্কতার সঙ্গে। পাছে মিসেস গ্রে দেখে ফেলেন, সে ভয়টাও ছিল। একবার চেষ্টা করলাম এই ফাইলের যাবতীয় গোপন তথ্যগুলি শরট হ্যানডে নকল করার। কিন্তু যুদ্ধের সেই প্রচণ্ড তৎপরতার মধ্যে সেটা ধরা পড়ে গেলে মারাত্মক পরিণতি হতে পারত। তাছাড়া মিসেস গ্রে যদি একবার ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেন এটা নকল করা হচ্ছে তবে ভবিষ্যতে নেতাজী সম্পর্কে কোন খবর পাওয়ার পথ আমার বন্ধ হয়ে যেত।

মিত্রশক্তির সকলেই ধরে নিয়েছিল জাপান ব্রহ্মদেশ দখল করে ভারতের দিকে এগোবে। ভারত অভিযানের এই ছক সিয়াকও জানত। সে কারণে মিত্রশক্তি ঠিক করেছিল বাংলা এবং আসাম থেকে সেনা সরিয়ে ওড়িশার দক্ষিণ ও বিহারের রাঁচি—রামগড়ের কাছে নিয়ে যাবে। ১০ / ১২ ডিভি-শনের এই বাহিনী জাপানকে রোখার জন্য সেকেন্ড লাইন অব ডিফেনস তৈরি করে যুদ্ধ করার কথা ছিল। ইংরাজ শাসক এভাবে ডিনায়াল পলিসি নেওয়ায় গোটা বাংলায় দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া নেমে এল। দেশের মধ্যেই তৈরি হল ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রনট। এই ফ্রনট জাপানকে রোখার ডাক দিল। সেই সঙ্গে নেতাজীর বিরুদ্ধেও পরোক্ষ প্রচার শুরু হল।

সিয়াকে বসেই বুঝতে পারছিলাম যুদ্ধ কিংবা শান্তি এই দুটি ব্যাপারেই সময় জ্ঞান একটা সাংঘাতিক দরকারি ব্যাপার। এদের গোপন খবর থেকে বুঝতে পারছিলাম, নেতৃত্বের অভাবে গোটা আজাদ হিন্দ ফৌজে চূড়ান্ত দলাদলি শুরু হয়ে গেছে ও সেটি নেতৃত্বের অভাবে পড়েছে। এই

১৯৩৮-র জানুয়ারিতে অস্ট্রিয়ায়

বিভ্রান্তির পিছনে এম আই-টু যে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে সেটাও বোঝা গেল। এই গোয়েন্দা সংগঠনটি আজাদ হিন্দ ফৌজকে ভেঙে দিতে উঠে পড়ে লেগেছে।

নেতাজী রণকৌশল বদলালেন

সম্ভবত নেতাজী ভেবেছিলেন হিটলারের জারমানই ভারতের মুক্তি-যুদ্ধে সাহায্য করবে। কিন্তু হিটলার তখন রাশিয়া আক্রমণ করে বসেছেন। সেখানে গণপ্রতিরোধের মুখে পড়ে আর এক পা-ও তিনি এগোতে পারছেন না। বারলিন থেকে বাগদাদ পর্যন্ত রেল লাইন পাতার যে স্বপ্ন হিটলার দেখেছিলেন তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অন্য দিকে 'মরুভূমির শৃগাল' জেনারেল রোমেলও টোব্রাক ও বেনগাজি পেরিয়ে এশিয়ার ভেতর দিকে আর আসতে পারছেন না।

সিয়াকে খবর এল, নেতাজী তাঁর স্ট্রাটেজি বদলেছেন। ১৯৪৩ সালের ৮ ফেবরুয়ারি জারমান ছেড়ে সাবমেরিনে চললেন টোকিও-র দিকে। এখানে সম্ভবত মিত্রশক্তির গোয়েন্দা বিভাগ ব্যর্থ হয়। কারণ তারা নেতাজীর টোকিও আগমনের খবর জানতেন না। তা সত্ত্বেও ৩ জুন তিনি যখন টোকিও পৌঁছলেন তখন অনেকেই বুঝেছিলেন যে যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। আরও আগে এ অঞ্চলে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার নিলে তিনি ভাল করতেন। প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ তখন ভেঙে গেছে। মোহন সিং জাপানীদের হাতে বন্দী ভারতীয় সেনাদের নিয়ে এই ফৌজ গড়েছিলেন। এক বৎসরও সে ফৌজ টিকে থাকেনি।

জাপানীদের সম্পর্কে নেতাজী গোড়া থেকেই সন্দিহান ছিলেন। টোকিও আসার পর তিনি তোজোর সঙ্গে একটা বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আবিদ হাসান, রাসবিহারী বসু এবং জেনারেল ভোঁসলে। সেখানে মৈত্রী ও সামরিক সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐ বছর ২৫ আগসট নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠিত করে তার সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন।

এরপরই সিয়াক সদর দফতর দিনরাত সিঙ্গাপুরের সোনান বেতার কেন্দ্র মনিটর করত। খবর রেকরড করা হত অন্য একটা ফাইলে। এই ফাইল সূত্রেই খবর পেলাম সোনানের ক্যাথে বিলডিং-এ ২১ অকটোবর আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

কয়েকটি সূত্রে খবর এসেছে দেখলাম, জাপান আজাদ হিন্দ ফৌজকে অক-জিলিয়ারি ফোরস হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। ভারতের মাটিতে তারা যেন কোনভাবেই প্রথম পা দিতে না পারে সেটাও লক্ষ্য রাখা ছিল জাপানের উদ্দেশ্য। সিয়াকের প্রচার কাজে তখন বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন এলডিং-টন কেন্যাড, ডাঃ রস, আমার বস মিসেস গ্রে, ডাঃ ডি ডবলু হানিওয়েল। মাঝে মাঝে তারা নিভৃতে বসে আজাদ হিন্দ ফৌজের স্ট্রাটেজি নিয়ে আলোচনা করতেন। এর থেকে যা আঁচ পেয়েছিলাম তাতে মনে হল, ইংরাজ কিছুতেই আজাদ হিন্দ ও জাপ সরকারকে হাত মিলিয়ে থাকতে দেবে না। বুড়ো সাম্রাজ্যবাদী জাতি হিসাবে ইংরাজ জাপানীদের সব চালাকি ধরে ফেলেছিল। তারা বেতারে ক্রমাগত প্রচার করত, 'তোমার ক্ষমতার অতিরিক্ত তুমি খেয়ে ফেলেছ, শীঘ্রই তোমার অগ্নিমান্দ্য দেখা দেবে।'

নেতাজী নিজেও জাপানের চালাকি ধরে ফেলেছিলেন। তাঁর সঙ্গে জাপান যে চুক্তি করেছিল কার্যক্ষেত্রে সে চুক্তি সে মানেনি। তারা মনে করত ফৌজের বেশ কিছু ইংরেজের গুপ্তচর। এটা সত্যি, ইংরাজরা সিঙ্গাপুর, মালয় ও ব্রহ্ম থেকে হটে আসার সময় বেশ কিছু ভারতীয় গুপ্তচর রেখে এসেছিল। তারা পরে উইনগেটের গেরিলাবাহিনী (chindits)-র সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে।

জাপান একদিকে প্রচার চালাচ্ছিল, 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য'। অন্যদিকে আবার তারাই বলতে লাগল, 'পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির উৎখাতের জন্য জাপানকে পুরো মদত দাও।' চালাকিটা ধরতে নেতাজীর বেশি সময় লাগল না। তিনি জাপানের ফাঁদে পা দিতে চাইলেন না। ইংরাজ বাহিনীর প্রচারযন্ত্র নেতাজীর এই আপসহীন মনোভাবের সুযোগ নিল। তাঁরা প্রতিদিনই বলতে লাগল, 'সাহসী বীর ভারতীয় সেনাবাহিনী কখনই জাপানের পঞ্চমবাহিনী হতে পারে না। জেনারেল তোজো যেন এ চেষ্টা থেকে বিরত হন। ভারতীয় রাজনীতি থেকে বিতাড়িত চন্দ্র বোস আজ জাপানী পুতুলে পরিণত হয়েছেন।

'আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতীয় সেনাবাহিনীরই অংশ। তারা কখনই ফ্যাসিবাদী জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তারে মদত দিতে পারে না। বীর ভারতীয় সেনাবাহিনী সাম্রাজ্যবাদী কুত্তা জাপানের গোলাম হতে পারে না। মালয়ের ইমাশিটা ইতোমধ্যেই ৬৮ হাজার ভারতীয় সেনাকে সে দেশের 'মৃত্যু রেলপথ' বানানোর সস্তা মজুরে পরিণত করেছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ সে জন্যই ওরা তৈরি করেছে।

১৯৪৩-নভেম্বরে টোকিওয় 'এশিয়ান নেশনস-এর সম্মেলনে' ভাষণরত

'ফ্যাসিস্ট তোজো, ইমাশিটা এবং হিরোহিতো ভারত অভিযানে আজাদ হিন্দ ফৌজকে মিত্রশক্তির কামানের সামনে ফেলে দিতে চায়। এক নিষ্ঠুর চক্রান্তের বলি হতে যাচ্ছে আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং এই বিয়োগান্ত নাটকের প্রধান নায়কের ভূমিকায় থাকছেন চন্দ্র বোস...।'

মিত্রশক্তির জঙ্গী বিমানগুলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আকাশে আকাশে এই লিফলেট ছড়াত লক্ষ লক্ষ। সারা রাত ধরে এই লিফলেট ছড়ান ছাড়াও সারাদিন ধরে চলত বিভিন্ন ভাষায় বেতার প্রচার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার অধিকৃত ফ্রানসের দ্য গ্যল এবং যুগোশ্লাভিয়ার মারশাল টিটো বাইরে থেকে সরকার গড়ে হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন ও স্বাধীনতা পেয়েছিলেন। ইংরাজের ভয় ছিল নেতাজী হয়ত বিপরীত পক্ষে সেই কাজই করতে যাচ্ছেন। তিনি যদি তাঁর আদর্শ থেকে একটু সরে গিয়ে ফিলড মারশাল তেরুচির সঙ্গে হাত মেলান তবে ইংরাজের সমূহ সর্বনাশ। গোটা জাপানী হাই কম্যান্ডের দাবি সেরকমই ছিল। তারা কখনই চায়নি যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানী বাহিনী আলাদা থাকুক।

ইচ্ছা করলে কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে পারতেন নেতাজী। তাঁর কাছে এখন বিবদমান দুপক্ষই সমান হয়ে গেল। পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের পুরনো উপনিবেশ পুনরুদ্ধারের জন্য জোট বেঁধেছিল। অন্যদিকে জাপান ও জারমান নতুন করে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চাইছিল। সংঘর্ষ বাধে সেখানেই। নেতাজী বুঝেছিলেন সেটা। এর মধ্যে একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছিল না। পরবর্তীকালে সেজন্য তার বিরুদ্ধেও মিত্রশক্তির অন্যরা কিভাবে ঘোঁট পাকিয়েছিল সে কথায় পরে আসছি।

নেতাজী যখন টোকিওতে আসেননি সে সময় কলকাতার ওপর প্রথম জাপানী বোমা পড়ে। টোকিও আসার পর নেতাজীকে না জানিয়েই জাপানীরা পুনরায় কলকাতা ও মাদরাজ বন্দরের ওপর বোমা ফেলে। সিয়াক খবর পেল, ব্রহ্মদেশ জয় করেই জাপান কলকাতা ও মাদরাজ দখল করবে প্রথমে। তারপর তারা সাঁড়াশী আক্রমণ চালাবে দিল্লির দিকে।

পোলিটিক্যাল ওয়ারফেয়ার ডিভি-শনের দপ্তরে বসে খবর পেলাম জাপানের ফিলড মারশাল তেরুচি নেতাজীর সঙ্গে দেখা করে তাদের পরি-কল্পনা পুরোপুরি বুঝিয়ে বলেছেন। এই ফাইল খুব সাবধানে পড়ার পর

আমি নিঃশব্দে সরে গেলাম। আর একবার মনে হল, পুরো ব্যাপারটা নকল করে রাখি। কিন্তু না, তাও সম্ভব হল না। যাই হোক, নেতাজী নাকি তেরুচির প্রস্তাব ও পরিকল্পনা ধৈর্য ধরে শোনেন। তারপর এক বাক্যে রায় দিয়ে দেন, 'ভারতের স্বাধীনতা ভারতেরই দায়িত্ব। এই দায়িত্বভার অন্য কারোর উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্ধুরাই লড়াই করে দেশের স্বাধীনতা আনবে।'

জাপানের বিরুদ্ধে সারা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় মুক্তির লড়াই শুরু হয়ে গেছে এটা লক্ষ্য করেছিলেন নেতাজী। মালয়ে চীন-পেন, ভিয়েৎনামে লা দুয়ান, ব্রহ্মে অউংসান সবাই ছিলেন জাপ-বিরোধী। নেতাজী এসব দেশের সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা জেনেও কি করে জাপানকে মদত দেবেন? চীনেও জাপানের অত্যাচারের কথা তিনি জানতেন। কারণ তাঁর সমস্তই কংগ্রেস থেকে চীনের মুক্তি-যোদ্ধাদের সাহায্য পাঠানো হয়েছিল। এর উপর মিত্রশক্তি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ঐ নেতাদের সাহায্য দিচ্ছিলেন উইন-গেটের মারফৎ। এম আই-টু এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক লড়াই তুঙ্গে তুলে নিয়ে যেতে পেরে-ছিল। উইনগেটের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর পরও এম আই-টু তাদের সাহায্যের হাত ছোট করেনি।

নেতাজী যখন সিঙ্গাপুরে

এই রকম জাপবিরোধী পরিস্থিতির মধ্যেই নেতাজী সিঙ্গাপুরে এসে হাজির হলেন। অর্থাৎ তাঁর আগমন আর একটু আগে ঘটলে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসও অন্যরকম হত। ততদিনে মারকিন বোমারু বিমানগুলি প্রশান্ত মহাসাগর ছেয়ে ফেলেছে। তাদের ফ্লাইং ফোর্টেসগুলি হাওয়াই, ফিলি-পাইনস এবং ওকিনাওয়া অঞ্চলে অহরহ বোমা ফেলে চলে যাচ্ছে। তাদের বেড়াজাল কাটিয়ে জাপানী বিমানের আর ব্রহ্ম, মালয়, তাইল্যানড, ভিয়েতনামে হরদম ঢুকে পড়া সম্ভব হচ্ছিল না। ১৯৪৩-এর জুলাই থেকে এই অবস্থা।

আমাদের কাছে খবর এল, জাপান ভারত সম্পর্কে তার পরিকল্পনা খুব শীঘ্র কার্যকর করতে চায়। এর মধ্যে নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের আলাদা কম্যানড তৈরি করে নিয়েছেন। তিনি ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতেই আসাম সীমান্তে ঢুকে পড়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। ইংরাজ সামরিক শক্তি এতে উল্লসিত হল। তারা ভয় পেয়েছিল নেতাজী জাপানী বাহিনীর হয়েই ভারতে ঢুকবেন। তারা বলতে লাগল 'চন্দ্র বোসের' বিরুদ্ধে তাদের মন-

নেতাজীর রণনীতি শেষ পর্যন্ত জিতেছে

দেবেশ দাশ

রণনীতি শুধু যুদ্ধ কুশলতা নয়। কূটনীতির সুব্যবস্থাও তার অন্তর্গত। কৌটিল্যের নীতি অনুসারে কণ্টকেনৈব কণ্টকম ছিল নিঃসহায় নিরস্ত্র ভারতীয়ের একমাত্র পথ। তাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মহাভারত, রোমান প্লুটারক ও বৃটিশ কূটনীতিকদের অনুসরণে শত্রুর শত্রুদের সঙ্গে সৌহার্দ্য করলেন। প্রথমেই তিনি স্বাধীন ভারতের অন্ত-র্বর্তীকালীন সরকার স্থাপন করলেন ও ১৯৪৩-এ ২৩ অকটোবর জাপান সরকার তাকে স্বীকৃতি দিল।

নেতাজীর সমরকৌশলও ছিল অসাধারণ। সেই সমরকৌশলের ফলে অতর্কিতে তাঁর বাহিনী আটটি প্রবাহে এগিয়ে এসে ইমফলের মাত্র তিন মাইলের মধ্যে পৌঁছে যায়। আই এন এ-র তিনটি ডিভিসনের মধ্যে দুটির কোন যানবাহন ছিল না। তবু নেতাজীর ভরসা ছিল যে, ইমফল হাতে এসে পড়লে মিত্র বাহিনীর অফুরন্ত সমরসম্ভার 'চার্চিল সাপলাই' দখল করে তার ফৌজ মাছের তেলে মাছ ভাজতে ভাজতে আসামের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে।

তাঁর দূরদৃষ্টি সফল হতে পারত। কারণ সেই সময় অ্যালায়েড ফোরথ কোর সেনাদলের অবস্থা এই অতর্কিত আক্রমণে এত করুণ হয়ে উঠেছিল যে, সমতল আসাম থেকে খাদ্য ও সামরিক সরবরাহের পথ বন্ধ হয়। তাদের রেশন অর্ধেক করে দেওয়া হয় যাতে অন্তত পঁচিশ দিন তারা আই এন এ-কে আটকাতে পারে।

এমন সময়ে পৃথিবীর ইতিহাসে তখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত একটি নতুন যুদ্ধপ্রণালী বৃটিশ-আমেরিকান মিত্রশক্তি রণক্ষেত্রে চালু করে। এখানে মনে রাখতে হবে যে ভারত-বরমা ফ্রনট বিরাট রাশিয়ান ফ্রনটের চেয়েও অনেক বেশি বিস্তীর্ণ ছিল।

আই এন এ-র এয়ার আমব্রেলা ছিল না বলে বৃটিশ পক্ষ ইমফলের ভিতরেও আজাদ হিন্দ ফৌজের পিছন দিকে এরোপ্লেন যোগে দেড় কোটি রেশন, সাড়ে আট লাখ গ্যালন পেট্রল আর দেড় হাজার টন খচ্চরের খাদ্য নামিয়ে দেয়।

শুধু তাই নয়। 'অপারেশন থারসডে' এই সাংকেতিক নামের একটি গোপন অপারেশনে সুদূর লুজাই অঞ্চলের একটি এরোড্রোম থেকে প্লেন ও প্লেনে টানা টাগ ট্রানসপোরটের সাহায্যে আই এন এ-র পিছনে নয় হাজার সৈন্য, আড়াইশ টন অস্ত্রশস্ত্র, কামানের সম্ভার যার প্রত্যেকটির ওজন ছিল পাঁচশো পাউনড, বুলডোজার এমনকি খাল নালা পার হবার জন্য বেইলি ব্রিজ নামিয়ে দেওয়া হয়। পাহাড়ে সেই সব বয়ে উঠিয়ে দেবার জন্য পনেরশো যুদ্ধের খচ্চর পর্যন্ত আকাশ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। সারা পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে এই অভিযান ছিল অভিনব। অন্যপক্ষে আই এন এ-র যৎসামান্য অস্ত্রশস্ত্র পর্যন্ত নিজেদের পিঠে করে বয়ে নিতে হয়।

বৃটিশ আরমি আই এন এ-কে এবং নেতাজীর প্রেরণাকে এত ভয় করেছিল যে, যে থারড ইনডিয়ান ডিভিসনকে আই এন এ-র মুখোমুখি রাখা হয়েছিল তা নামেই ছিল ইনডিয়ান। কিন্তু তার চব্বিশটি ব্যাটালিয়নে ছিল বৃটিশ, ছিল নাইজেরিয়ান, এমনকি বর্মী, কিন্তু ছিল না কোন ইনডিয়ান।

অবশেষে নেতাজীর বাহিনীকে পিছু হঠতে হয় তাঁর রণকৌশলের বা শৌর্যবীর্যের অভাবে নয়, শত্রুর সমর সম্ভারের চাপে। বীরোচিত সত্যনিষ্ঠ ভাষায় তিনি সে কথা স্বীকার করে ১৯৪৪-এর ১৩ আগসট ঘোষণা করেন যে 'এই স্বাধীনতার অভিযান বড় বেশি দেরিতে শুরু হয়েছিল। দারুণ বর্ষায় প্রবল প্রতিবন্ধক হয়েছিল। ...কিন্তু মাতৃভূমির স্বাধীনতা না হওয়া পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করতে কৃতসংকল্প।

সেই সংকল্প তিনি পালন করতে পেরেছিলেন। তাঁর যুদ্ধ বিজয় হয়েছিল সীমান্তের রণক্ষেত্রে নয়, দেশের মানসভূমিতে। আই এন এ সেনা সমতল ভারতে সশস্ত্র হয়ে অবতীর্ণ হতে পারেনি। কিন্তু যুদ্ধে ধৃত আই এন এ নেতাজীর দূরদর্শী ব্যবস্থার ফলে লালকেল্লার বিচারে যুদ্ধবন্দী ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনের সকল সুরক্ষার অধিকারী বলে সাব্যস্ত হয়। অহিংস কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ মায় ভাবীকালের প্রধানমন্ত্রী নেহরু এই সশস্ত্র সংগ্রামীদের সমর্থন করেন এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ভাষণ ও বৃটিশ পারলামেনটের রেকরড থেকেই আইনসঙ্গত যুক্তি উদ্ধৃত করেন। নেতাজীর দূরদর্শী রণনীতির ফলেই এই জয় সম্ভব হয়। পরবর্তীকালে লালকেল্লার বিচার তখন সামরিকভাবে 'দিললি চল' নয়, মানসিকভাবে সারা ভারত অধিকার করে। তারই ফলশ্রুতি যুদ্ধোত্তরকালে বিভিন্নকালে ও স্থানে বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সামরিক, নৌবাহিনী ও পুলিশ বিদ্রোহ। অর্থাৎ ভারতে বৃটিশ শক্তির স্তম্ভগুলির ক্ষয়। দেশের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল। □

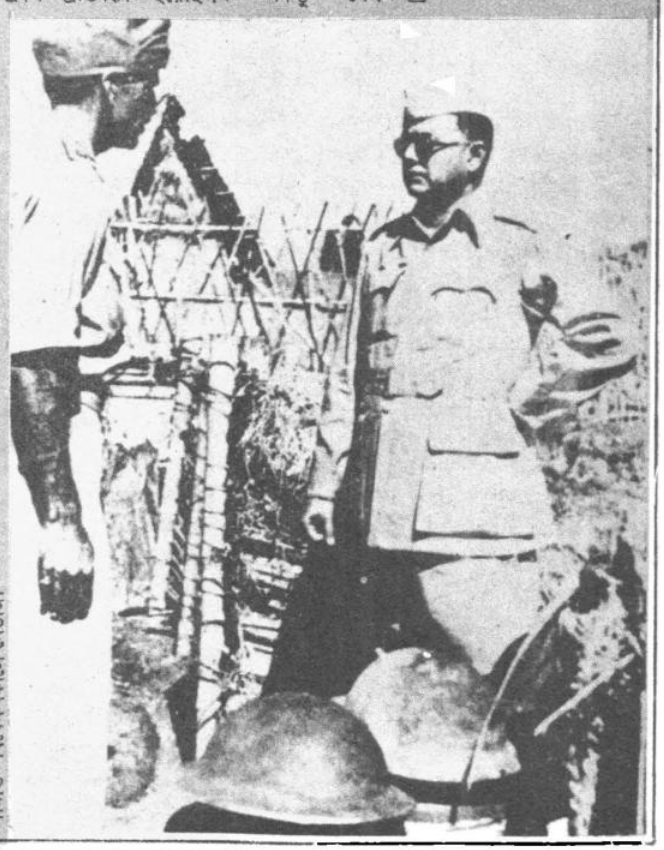

সীমান্ত পর্যবেক্ষণকালে নেতাজী

আত্মিক লড়াই এক রাউনড জিতে গেছে।

হিটলার অধিকৃত ইওরোপীয় 'স্বাধীন সরকার' সমূহের সদর দপ্তরগুলি তখন ছিল লনডনে। তাদের কোন-পৃথক কম্যানড থাকত না। ফলে হিটলারের পক্ষে তাদের সামলানো মুশকিল হয়েছে। নেতাজীর ক্ষেত্রে তার বিপরীত হওয়ায় তারা বুঝেছিল তিনি ভবিষ্যতে আর বেশি সুবিধা করতে পারবেন না।

সিয়াকের কাছে গোপন খবর ছিল, নেতাজীর আপত্তিতেই জাপান ভারতের ওপর বোমা বর্ষণ বন্ধ করে। তারা জানতে পেরেছিল, নেতাজী আশা করেছিলেন গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন এক ব্যাপক বিপ্লবের আকার নেবে। তিনি ভেবেছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যেও এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়বে এবং ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কীর্তি ম্লান করে দেবে।

এই বিদ্রোহী ভারতীয় সেনাবাহিনীই আজাদ হিন্দ ফৌজের 'গান্ধী ব্রিগেড' এবং 'সুভাষ ব্রিগেড'-এর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে 'দিল্লি চলো' অভিযান সফল করে তুলবে। তাই আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে বেতার ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'আপনারা ইংরেজের সমরযন্ত্র ও যুদ্ধ প্রচেষ্টা ধ্বংস করুন। আজাদ হিন্দ ফৌজ এগোচ্ছে।'

সিয়াক তার গোপন 'চন্দ্র বোস' ফাইলে নোট দিল, **Bose's only aim is to set foot on the Indian soil, and to make contact with the 'rebel' forces of the Indian army. Jap Commanders including Fld Marshal Terauchi wants Jap forces to be at the vanguard and certainly does not approve of Bose's ideas to go it alone in its Indian adventure '**

'এই সময়েই এম আই-টু সূত্রে খবর আসে যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের সামনে একটি সম্রাট হিরোহিতোবাহিনী রাখাই জাপানের উদ্দেশ্য। যদিও আজাদ হিন্দ ফৌজ সেটা মানছে না। কিন্তু সেজন্য জাপান আজাদ হিন্দ সরকার ও ফৌজের বিরুদ্ধাচরণ করবে না।

অথচ আমরা দেখেছি ১৯৪২ সালের ১৫ জুন ব্যাংককে যে প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয় তার অস্তিত্ব ছিল মাত্র এক বছর। তা ভেঙে যাবার পরই তার সেনাধ্যক্ষ জেনারেল মোহন সিং-কে জাপানীরা বন্দী করে এবং বাটাভিয়ায় পাঠিয়ে দেয়। এবারে নেতাজীর সঙ্গে অন্য ব্যবহার কেন?

তার কারণ একটাই। জাপান আশা করেছিল, রুশ দেশ জয় করার পর হিটলারের বাহিনী জাপানের সাহায্যে এশিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে এবং জাপান তখন অক্ষশক্তির পুরো সাহায্য নিয়ে সমগ্র এশিয়ার উপর সাম্রাজ্য কায়েম করবে। কিন্তু হায়, রুশদেশের লেনিনগ্রাদেই হিটলারের কবর রচিত হয়ে গেল। দেখা গেল তার পরই জাপানও আর এক পা এগোতে পারছে না।

নেতাজী যুদ্ধশেষের এই পরিস্থিতি বুঝেছিলেন। সেজন্য তিনি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। এই যোগাযোগ কিছুটা সম্ভবও হয়েছিল। হরিদাস মিত্র এবং আরও অনেকে এই যোগাযোগ করার সূত্রে ইংরাজের হাতে ধরা পড়েন।

১৯৪৪ সাল নাগাদ জাপান তার ভারত সংক্রান্ত নীতি বদলে ফেলে। কিন্তু বদলালেও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হল না। তারা চাইল না যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত জয়ের গৌরব অর্জন করুক। ইতোমধ্যে উইনগেটের পরিকল্পনা মত কারেন বর্মী, নাগা, কুকি এবং সীমান্তের আরও কিছু পার্বত্য উপজাতি নিয়ে যে দল গড়া হয়েছিল তারা রীতিমত তৎপর হয়ে উঠল। তাছাড়া তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন কূটনীতিবিদ সর্বাধিনায়ক লরড মাউনটব্যাটেন ব্রহ্মদেশ হতে জাপানের দৃষ্টি সরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে নিয়ে গেলেন। ওকিনাওয়া, লুজন, মিনদানাও, সারোয়াক প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানের নাভিশ্বাস উঠিয়ে ছাড়লেন তিনি।

এই সময়ই 'চন্দ্র বোস' ফাইলে লেখা হয়েছে **'The land, sea and formidable air attacks on the Pacific islands have stolen the winds out of the sails of Japanese war machine. This has not only stalled its planned advance into India but prevented it (Japan) from making any sizable arms aid to Bose, whose dream of making forays into India has gone awry.'**

পোলিটিক্যাল ওয়ারফেয়ার ডিভিশনের ইনটেলিজেনস সেকশনে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি ভারতীয় অফিসারের পরিচিতিসহ ফাইল রাখা ছিল। বিশেষত 'গান্ধী ব্রিগেড' ও 'সুভাষ ব্রিগেড'-এর অফিসাররা ইংরাজেরও মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। এই দুই ব্রিগেড অকুতোভয়ে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত। এই দুই ব্রিগেডের নমস্য অফিসারদের মধ্যে ছিলেন লেফটেনানট করনেল ইশান কাদির, লেফটেনানট করনেল শাহনওয়াজ খান, লেফটেনানট করনেল গুলজারা সিং, লেফটেনানট করনেল এম জেড কিয়ানী, লেফটেনানট করনেল জে কে ভোঁসলে, মেজর মেহবুব আহমেদ, করনেল রোডরিগস, করনেল জি এস ধীলন, মেজর রঙ্গনাথন, মেজর রামস্বরূপ, মেজর মেহর দাশ, করনেল ঠাকুর সিং প্রমুখ।

সিয়াকে খবর এল, ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে হাকা-ফালমরের ৬ হাজার ফিট ওপরে আজাদ হিন্দ ফৌজ রীতিমত লড়াই চালাচ্ছে। তারপর খবর এল, তিদ্দিম, তামু, ক্যালাড্যানি ও ইমফলেও তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চলছে। এ সময় চুক্তি অনুযায়ী কোন কোন ফ্রনটে জাপানী ব্যাটেলিয়ন উপস্থিত ছিল। কিন্তু সিয়াকে বসেই জানতে পারলাম জাপানী বাহিনীর সঙ্গে এখানে ওখানে আজাদ হিন্দ বাহিনীরও সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে।

নেতাজী ও তাঁর মন্ত্রিসভা

যুদ্ধে আজাদ হিন্দ বাহিনী মিত্রশক্তির বাহিনীকে অনেক জায়গায় রীতিমত কাবু করে দিয়ে দখল নিচ্ছিল। কিন্তু জাপানী বাহিনী তাদের খাদ্য যোগানোর বদলে ভাগ বসাতে লাগল। এই অন্যায় ভাগাভাগি আজাদ হিন্দ বাহিনীর যুদ্ধরত স্বাধীনচেতা সেনাবাহিনী সহ্য করতে পারেনি।

ইঙ্গ-মারকিন যৌথ কম্যানডের আক্রমণ কিন্তু এ-সময়ে তীব্রতর করা হল। উত্তর আফরিকা ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে কয়েক ডিভিশন সৈন্য তারা সরিয়ে এনে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে নিয়োগ করল। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের কাছে তারা কোহিমা, ডিমাপুর, মইরান এবং কালেওয়া সেকটরে পর্যুদস্ত হল। সে সময়কার প্রখ্যাত ইংরাজ সাংবাদিক স্টুয়ারড গেলডার সেই সেকটর থেকে রিপোরট পাঠালেন ঃ **...Bottles of scotch and beer cans lay littered along with hundreds of bodies of Scotish Highlanders and U S negros.**

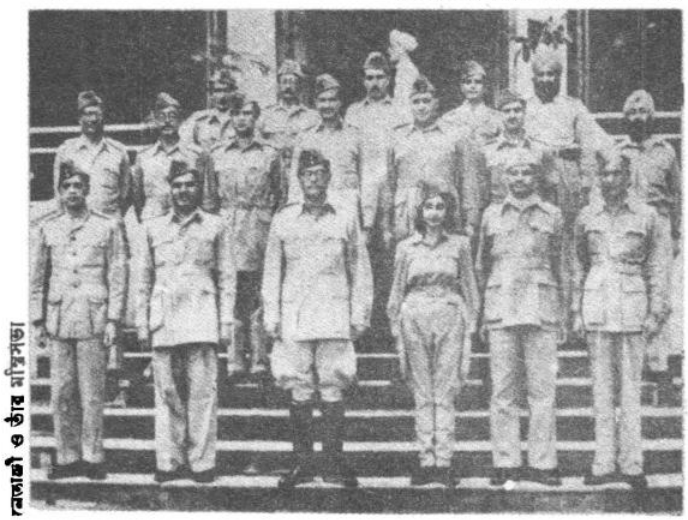

স্টুয়ারড গেলডার ছিলেন এক অসমসাহসী সাংবাদিক। জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই-এর সময় তিনি লনডন টাইমস-এর প্রতিনিধি হিসাবে চুংকিং-এ ছিলেন। সেখানে তখন থাকতেন রয়টারের ডুন ক্যামবেলও। জাপানের আত্মসমর্পণের পর এরা দুজনেই দিল্লি এসে পৌছান। সেখান থেকে পর পর কয়েকটি ডেসপ্যাচে তারা এ-অঞ্চলে ইংরাজের স্বৈরাচারী চেহারা তুলে ধরেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যানড এবং এম আই-টু তা পড়ে ক্ষেপে যায়। দাবি উঠল এই দুজনকে ব্রহ্ম ও মালয় থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। ফলে ক্যামবেল দিল্লিতে থেকে গেলেন এবং গেলডার দেশে চলে গেলেন বাধ্য হয়ে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ কেন জিততে পারল না

মারাত্মক লড়াই করেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিততে পারল না আজাদ হিন্দ ফৌজ। রসদের অভাব, খাদ্যের অভাব, চিকিৎসার অভাব ইত্যাদির জন্য তারা পেছু হটতে বাধ্য হলেন শেষ পর্যন্ত। জাপান অনেক আগেই পেছু হটে গেছে। কারণ ইতোমধ্যে অউংসানের গেরিলাবাহিনীও রীতিমত লড়াই শুরু করে দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে সিয়াক দফতর থেকে প্রতিদিন প্রচার করা হচ্ছে, 'ব্রহ্মবাসীগণ, তোমরা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোল। জাপানকে তাড়াও। দেশকে অসভ্য পীতবর্ণ সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন থেকে মুক্ত কর। ইংরাজ তার লুপ্ত সাম্রাজ্য দখল নিতে যাবে না। তোমাদের

হামবুর্গে নেতাজী (১৯৪২)

স্বাধীনতা তোমরাই বুঝে নাও।'

এই সময়েই বলি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মারকিন চক্রান্তের কথা। চীনের যুদ্ধকালীন রাজধানী চুংকিং-এ ছিলেন মারকিন জেনারেল স্টিলওয়েল, ওয়েডমেয়ার এবং জরজ মারশাল। এরা হঠাৎ দিল্লি এসে হাজির হলেন। এখানে খুব গোপনে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত ইঙ্গ-মারকিন যুদ্ধজোটের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। প্রথম দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন লরড ওয়াভেল। শেষ দুদিন ছিলেন লরড মাউন্টব্যাটন। এখানকার আলোচ্য বিষয় কী ছিল তা পরিষ্কার না বুঝলেও সিয়াকে বসে বুঝলাম দুটি বিকল্পের মধ্যে মিত্রশক্তি একটি বেছে নিতে চাইছে। তা হল: সোভিয়েত সেনাবাহিনী জাপানের হাত থেকে কোরিয়া এবং মঞ্চুরিয়া মুক্ত করে নিয়েছে। শীঘ্রই তারা জাপানের বন্দরগুলির উপর হামলা চালাতে পারে। এরকম হলে পুরনো সাম্রাজ্যবাদীরা আর হৃতরাজ্য ফিরে পাবে না। ফলে পেনটাগনের উচিত সোভিয়েত লাল ফৌজ জাপান পৌঁছনর আগেই কোন একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিয়ে ফেলা।

অন্যদিকে জেনারেল তোঁজো, জেনারেল ইমাশিটো এবং 'চন্দ্র বোস'কে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে গণ্য করা। এ ব্যাপারে এম আই-টু সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

এই গোপন বৈঠকের পরই প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপপুঞ্জে এবং খোদ জাপানের ওপর ব্যাপক বোমাবর্ষণ শুরু হয়ে যায়। জাপান বাইরে থেকে সমস্ত সাহায্য পাবার আশা পুরোপুরি ছেড়ে দেয়। সিঙ্গাপুর, পেনাং, যোহর-বারু, কুয়ালালামপুর, দক্ষিণ ব্রহ্মের মউলমীন হতে উত্তর ব্রহ্মের ভামো পর্যন্ত সব শহর ও গ্রামেই এম আই-টু গোয়েন্দা-বাহিনী তাদের ব্যাপক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে। এরই সর্বশেষ পরিণতি, হিরোশিমা ও নাগাসাকির ওপর বোমাবর্ষণ।

এই বোমাবর্ষণ না হলে কী হতে পারত? সম্ভবত সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিত্রশক্তির অন্যদের লড়াই বেধে যেত। লাল ফৌজ তখন চীনের মাঞ্চুকুও (মাঞ্চুরিয়া), মুকদেন ও গোটা পূর্ব উপকূলের শহরগুলি থেকে জাপবাহিনীকে গরুখেদা করছে। খোদ জাপানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া আর চব্বিশ ঘণ্টার মামলা। একবার যদি কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ ও জাপান লাল ফৌজের করায়ত্ত হত তবে সে হত মিত্রশক্তির অন্যদের কাছে এক দুঃস্বপ্ন। দুনিয়ার চার ভাগের তিন ভাগই চলে যেত তাহলে সাম্যবাদীদের কবলে।

হিটলার ও তোজোকে ধ্বংস করেও তাহলে পুরনো সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সাম্রাজ্য ফেরৎ পেত না। ইংরাজ প্রধানমন্ত্রী চারচিল নাকি সেনাপতি মনটেগোমারিকে আদেশ দিয়েছিলেন Stack the German arms. অর্থাৎ যদি সোভিয়েত আক্রমণ করতে হয় তবে অস্ত্রের দরকার লাগবে। তার দরকার হল না। এশিয়ার একটি দেশের উপর অবাধে আণবিক বোমা ফেলে মারকিন বাহিনী সোভিয়েতকে থমকে দিল।

সিয়াকে আমার এক সহকর্মী ছিলেন মাই যে ফাউ। তৎকালীন ফরাসি ইনদোচীনের রাজধানী সায়গনের ছেলে। সোরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপস। প্যারিসে থাকাকালীন কিছুদিন ভিয়েতনামের নেতা হো-চি-মিনের একান্ত সচিবের কাজ করেছিলেন। আমি তাঁকে ইংরাজি শেখাতাম। তিনি আমাকে শেখাতেন ফরাসি। এই অতি দ্রুত বহমান সময়ে অনেক কিছুই আমি বুঝতে পারতাম। ফাউ আমাকে রাজনীতির সব জটিল গ্রন্থি খুলতে সাহায্য করতেন। তবে আমরা যে পরস্পরের পরিচিত সে কথা সিয়াকের কর্মকর্তাদের বুঝতে দিতাম না।

এই ফাউ-এর কাছে নেতাজীর ব্যাপারে অনেক গোপন তথ্য ছিল বলে আমি জানতাম। যুদ্ধের শেষ দিকে কলকাতা শহরের এক জনবহুল রাস্তায় ফাউ-কে দিনের বেলায় মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করা হয়। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

ফাউ আমাকে বড় ভাই-এর মত অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতেন। তিনিই বলেছিলেন, জাপানের প্রতিরোধ শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে অনেক আগে। তারা আজাদ হিন্দ ফৌজকে একা ফেলে রেখে সব জায়গা থেকে পালাচ্ছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে যে এম আই-টুর চর ছিল এ কথা ফাউ-এর কাছে আমি প্রথম শুনি।

ফাউ একদিন বললেন, 'জান তো ইংরাজ ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্বারা তার নষ্ট সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারে ফরাসি অধিকৃত ইনদোচীন এবং ডাচ অধিকৃত ইনদোনেশিয়ার ভাগ্য একই। মারকিন প্রেসিডেনট ট্রুম্যান নির্বাক দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন মাত্র।'

সিয়াকে আমার চাকরির তিন বছর পূর্ণ হয়েছে। এ সময় সায়গন যাবার কথা হল। কিন্তু সেখানকার অধিবাসী নাকি প্রতিটি রাস্তার মোড়, বাড়ির বারান্দা, গাছের ডালে স্লোগান লিখে রেখেছে, 'ভারতীয় দেখামাত্র গুলি কর।' ফাউকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে বললেন, ভারতীয় জওয়ানরাই এশিয়ায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দখলদারী সৈন্য হিসাবে কাজ করছে। সাম্রাজ্যবাদীদের চৌকিদার হল ইংরাজ আর চৌকিদারের লেঠেলের ভূমিকা নিয়েছে রাজপুত, গোরখা, শিখ, পাঠান প্রভৃতি ভারতীয় সেনাবাহিনী।' এসব দেখে সায়গন যাওয়া বাতিল করলাম।

ফাউ বলেছিলেন, নেতাজী এই ছড়িয়ে থাকা ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যেই বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন। তা যদি সম্ভব হত তবে এশিয়ার সাম্রাজ্যগুলি চুরচুর করে ভেঙে পড়ত।

ডেথ স্কোয়াড

যত দিন যেতে লাগল, লক্ষ্য করতাম সিয়াক এবং এম আই-টুর তৎপরতা সাংঘাতিক বেড়ে গেছে। মনে হল তারা যেন গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটা জাল ফেলেছে। তবে এ ব্যাপারে মারকিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ বোধ হয় বিশেষ ছিল না। এই এলাকার কয়েকজন বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক নেতাকে হত্যার জন্য এরা একটি গোপন ডেথ-স্কোয়াড গঠন করেছিল সেটা আমি জানতাম।

১৯৪৫-এর জুলাই পর্যন্ত নেতাজীর বক্তৃতা দৈনিক রেডিও মনিটরিং হত। 'চন্দ্র বোস' ফাইলে সে সব লিপিবদ্ধও করা হত। জুলাই-এর পর ছয় ভলিউমের ঐ ফাইল সরিয়ে ফেলা হল। এরপর আর কিছু জানার উপায় নেই। মাঝে মাঝে ফাউকে বিরক্ত করতাম মাত্র।

ডেথ স্কোয়াডের কাজকর্মই এরপর মুখ্য হয়ে দাঁড়াল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু ভাষাভাষী লোক এতে নানাভাবে জড়িয়ে পড়ে। সাম্রাজ্য পুনরাধিকার না করে সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে নড়বড়ে রেখে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের সম্ভাবনা নষ্ট করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

এ কারণে ডেথ স্কোয়াডের কাজকর্ম বেড়ে গেল ভয়ঙ্করভাবে ব্রহ্ম, মালয় ও তাইল্যানডে। সাংবাদিক স্টুয়ারড গেলডার-এর কাছে আমরা জানতে পারলাম স্কোয়াডের গুপ্তহত্যাকারীদের এক তালিকা রয়েছে। তিনি বোধহয় কোন নিবন্ধে তা প্রকাশও করেছিলেন। এই সময় তিনি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী জঘন্য কাজের নিন্দা করেছিলেন।

এই অঞ্চলের দেশপ্রেমিক নেতারাই ছিলেন সম্ভাব্য হত্যার তালিকায়। তাদের মধ্যে চন্দ্র বোস, হো চি-মিন, জেনারেল অউংসান, চীন-পেন প্রমুখের

সাবমেরিনে য়ুরোপ ছেড়ে যাচ্ছেন নেতাজী, সঙ্গে আবিদ হাসান

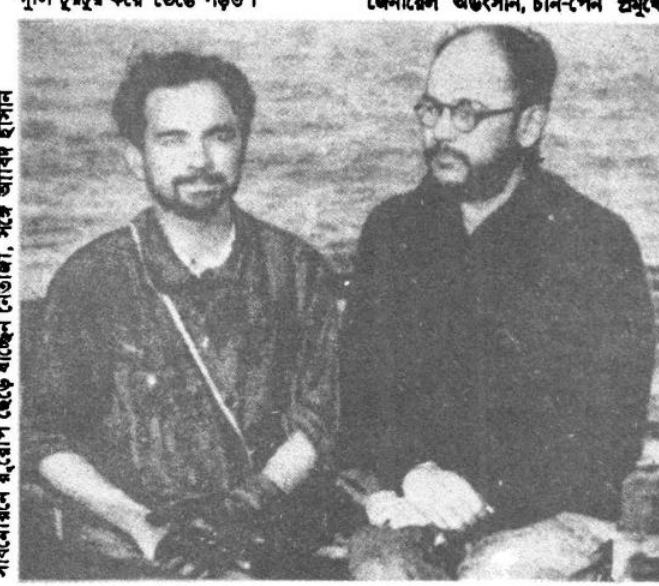

কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অভিবাদন নিচ্ছেন নেতাজী। মতিলাল নেহরু, জে.এম. সেনগুপ্ত (১৯২৮)

নাম উল্লেখযোগ্য। ডেথ স্কোয়াডের জাল আসাম থেকে তাইল্যান্ড পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে নেতাজীর গতিবিধির কোন খবর আমরা পাচ্ছিলাম না। তবে এ সময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটারজি, এ এন সরকার, লেঃ হাবিবর রহমান, মেজর জেনারেল কিয়ানী, দেবনাথ দাশ, এস এ আয়ার। নেতাজী সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন ইংরাজ দখলদারী সেনাবাহিনী পরাজিত জাপানী সেনাধ্যক্ষদের সাহায্য নিয়ে এক জঘন্য চক্রান্তের জাল ফেলেছে। তারা যুদ্ধাপরাধী হিসাবে কয়েকজনের বিরুদ্ধে বিচারের প্রহসন করবে এবং নানা অছিলায় বিশিষ্ট কয়েকজনকে হত্যা করতেও দ্বিধা করবে না।

১৫ অগাসট রাত্রে মোটরে করে ক্যাথে বিলডিং-এ আসেন নেতাজী। এখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের বেতার কেন্দ্র (রেডিও সোনান) ছিল। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দিতে চাইলে জাপানী সেনসর অফিসার তাঁকে প্রথমে পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাতে বলেন। নেতাজী এ আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করে বলপূর্বক স্টুডিও-তে ঢুকে যান এবং তাঁর শেষ বেতার ভাষণটি দেন। এই ভাষণ সিয়াকের সদর দপ্তরে মনিটর করা হয়।

পরদিন খবর পেলাম 'নেতাজী কয়েকটি জরুরী আলোচনার জন্য টোকিও যাচ্ছেন।' টোকিও-র পথে কেন? আমরা বেশ দ্বিধায় পড়লাম। জাপানের আত্মসমর্পণ এবং আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরও সেই শ্মশানের পথে কেন? তাছাড়া রেডিও টোকিও তখন স্তব্ধ। মারকিন জেনারেল ডগলাস ম্যাকআরথার মিকাডোর বসে রয়েছেন।

১৭ অগাসট আমরা জানতে পারলাম, সিঙ্গাপুর থেকে একটি বোমারু বিমান ব্যাংককে গিয়ে পৌঁছেছে সকাল সাড়ে ১০টায়। নেতাজী ছাড়া তাতে আর কেউ ছিলেন না। সেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের ২/৩ জন হাবিলদার ছাড়া আর কারোর সাক্ষাৎ তিনি পাননি।

সমস্ত দিন ধরে বসে খবরের সব চ্যানেলেই চোখ রেখে যাচ্ছি। বেলা চারটার সময় সিয়াকের সদর দপ্তর ক্যানডি থেকে অন্যত্র খবর গেল ছোট একটা টেলিগ্রাম মারফৎ। আমি স্তম্ভিত হয়ে ফাউ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম তার দিকে। ফাউ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমায় বললেন, **'The death squad has done its job....'**

টেলিগ্রামের ভাষা ছিল এরকম **'Kandy—17/8 Stop 1510 Stop AZAD HIND GOVT LEADER SHOT DEAD PARAIDES SNOON WHILE MEETING AT BANGKOK HOTEL STOP DETAILS AWAITED EOM'**

এর চেয়ে বেশি খবর পেলাম না। ফাউ বললেন, 'গুলিতে নিহত ভারতীয় নেতা বলতে নেতাজী চন্দ্র বোসকেই বোঝাচ্ছে। কারণ আজ সকালে তিনিই একমাত্র আজাদ হিন্দ সরকারের নেতা যিনি ব্যাংকক শহরে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আর কেউ যাননি।' আমার মনের অবস্থা বুঝে ফাউ বললেন, 'নেতাজী চন্দ্র বোসের পরিকল্পনা ছিল হয়তো কোন অজ্ঞাত মুলুকে পাড়ি দেওয়া। ডেথ স্কোয়াডের শিকারীদের চোখে ধুলো দেবার জন্য রটিয়েছিলেন কয়েকটি জরুরী বিষয়ের আলোচনা করতে তিনি টোকিও যাচ্ছেন।'

১৮ আগসট জাপানের যুদ্ধকালীন সংবাদ সংস্থা 'ডোমাই' এজেন্সি উদ্ধৃত করে রয়টার সারা দুনিয়ায় খবর ছড়িয়ে দিল '...জাপান সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান নেতা সুভাষচন্দ্র বোস সিঙ্গাপুর থেকে টোকিও যাত্রা করেন। ১৮ আগসট বেলা ২টায় তাইহোকু বিমান ক্ষেত্রে তাঁর বিমানটি এক দুর্ঘটনায় পড়ায় তিনি গুরুতররূপে আহত হন। সেখানে এক হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলে কিন্তু মধ্য রাতেই তিনি মারা যান...'।

ডেথ স্কোয়াডের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আরও খোঁজখবর নেওয়া দরকার। লরড মাউনটব্যাটেন ভারতের মত ব্রহ্মদেশকেও টুকরো টুকরো করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোনভাবেই তিনি অ্যানটি-ফ্যাসিসট পিপলস ফ্রিডম পারটির চেয়ারম্যান জেনারেল অউংসানকে বশে আনতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯ সালে আততায়ীদের হাতে জেনারেল অউংসান এবং তাঁর মন্ত্রিসভার আটজন জঘন্যভাবে নিহত হন।

তাইল্যান্ড, মালয়ের হাজারখানেক স্বাধীনতা সংগ্রামীও প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য ভাবে নিহত হন এ সময়ের মধ্যে। তারা জাপানের বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দেশের স্বাধীনতাকে এগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যেই আমার ভিয়েতনামী বন্ধু ফাউ কলকাতায় নৃশংসভাবে মারা পড়েন।

নেতাজীর রহস্যজনক অন্তর্ধান এখনও রহস্যের ঘেরাটোপেই রয়ে গেছে। আমি ও আমার প্রয়াত বন্ধু মাই যে-ফাউ নেতাজীর ব্যাপারে অনেক সময়ই আলোচনা করতাম। আমরা দুজনেই অনেক বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি দুনিয়ার স্টেশনগুলি মনিটরিং করার কাজে। তাই নেতাজীর অনেক পদক্ষেপ সশ্রদ্ধভাবে লক্ষ করতে পেরেছিলাম।

ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা নিশ্চয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিকামীদের নিয়ে আরও আলোচনা ও গবেষণা করবেন। তার থেকেই বেরিয়ে আসবে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে অনেক অজানা সত্য।

জাপান আত্মসমর্পণ করার কিছু আগে থেকেই নেতাজীর ধ্যান-ধারণা ও রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরাট পরিবর্তন এসেছিল এটা বুঝতে পারি তাঁর শেষ দিককার কার্যকলাপ দেখে। উপযুক্ত পণ্ডিতরা সেদিক নিয়ে আলোচনা করলে নিশ্চয়ই তা আরও বেশি বুঝবেন। □

আলোকচিত্র : নেতাজী রিসারচ ব্যুরোর সৌজন্যে

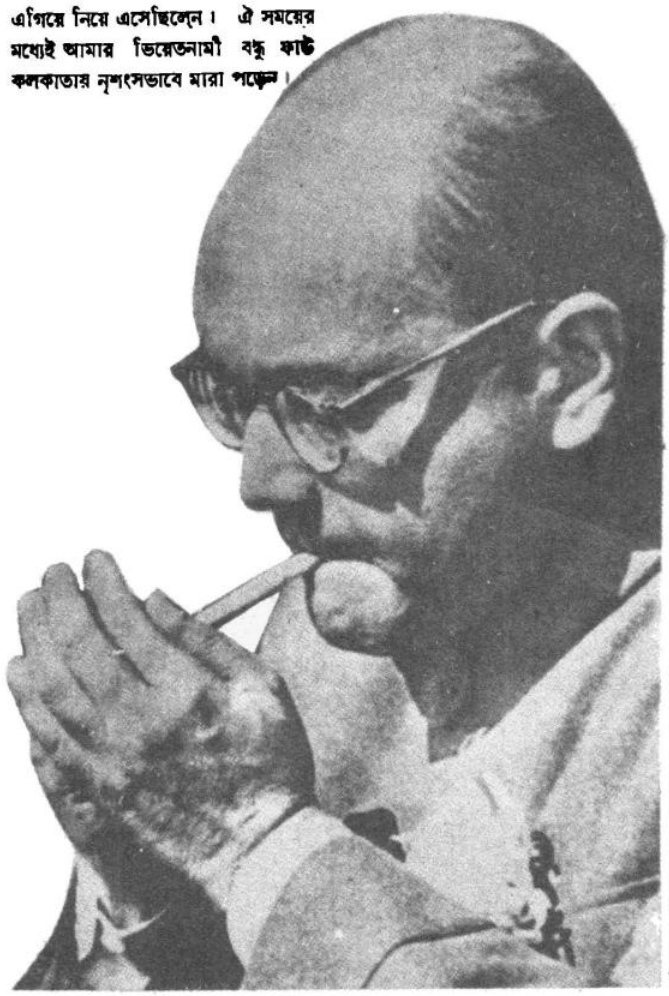

সচরাচর দেখা যায়না এমন ভঙ্গীতে নেতাজী

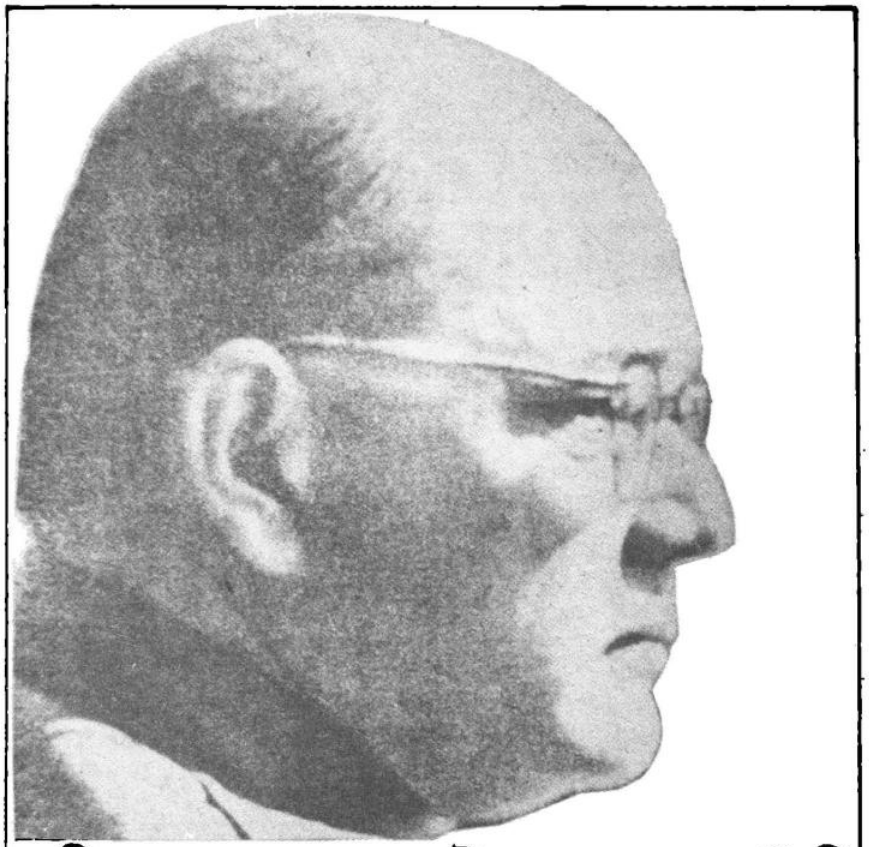

বন্দী সুভাষচন্দ্র ও একটি অনশনের কাহিনী

লাডলীমোহন রায়চৌধুরী

এই কাহিনীর সময়ঃ খৃস্টাব্দ ১৯৪০, স্থানঃ কলকাতা প্রেসিডেনসি জেল, এবং নায়কঃ কারাগারে বন্দী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ জুড়ে তখন তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা। ভারতবাসীর সম্মতির তোয়াক্কা না করে ইংরাজ সরকার ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেছে। ইংরাজের সেই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ মদত দেবে কি দেবে না এই প্রশ্নে কংগ্রেস শিবির তখন দ্বিধাবিভক্ত। কংগ্রেসের বামপন্থী তরুণ দল ইংরাজের যুদ্ধ বয়কট করার ডাক দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন। তাঁদের এই দ্রুত সিদ্ধান্তের ফলে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের দ্বিধার অবসান ঘটে। ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনে যুক্ত হলেন। ফলে ভীত রাজশক্তি যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধাদানকারী নেতাদের জেলে ভরতে লাগলেন। ভারতরক্ষা আইনের বলে সরকার চারদিকে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তারী অভিযান শুরু করে দিলেন।

সুভাষচন্দ্র নিজেও গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারের বিস্তর অভিযোগ। ইংরাজের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়ার জন্য জনমত সংগঠন করার কাজে তিনিই অগ্রণী হয়েছিলেন। তাঁর হিসেব মত যুদ্ধে ইংরাজের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং এই পরিস্থিতিতে তার দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার করে শুরু করা উচিত, এই ছিল সুভাষচন্দ্রের মত। ইংরাজকে বিপাকে ফেলার জন্য তাঁরই সৃষ্ট ফরওয়ারড ব্লক সর্বপ্রথম রাজ্য জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে দেয় এবং একে একে অন্য সবাই সেই আন্দোলনের সামিল হন। দেশের বিপ্লবী বামপন্থী যুব শক্তিকে তিনি বিগত প্রায় দু-বছর ধরে নানাভাবে ইংরাজের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছেন। এইসব ক্ষিপ্ত তরুণ দল গ্রামে গ্রামে কৃষক বিদ্রোহের প্ররোচনা দিয়েছে এবং এরাই আবার কল-কারখানায় শ্রমিক অশান্তিতেও ইন্ধন যুগিয়েছে। প্ররোচনামূলক বক্তৃতা এবং খবরের কাগজের নানা সংখ্যায় ইংরাজ বিরোধী নিবন্ধ রচনা করেও সুভাষচন্দ্র সরকারের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ইংরাজি সাপ্তাহিক 'Forward Block' পত্রিকায় সুভাষচন্দ্রের লেখা 'The Day of Reckoning' শীর্ষক প্রবন্ধটি কর্তৃপক্ষের বিশেষ অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এই জন্য তাঁর বিরুদ্ধে সরকারের তরফে একটি মামলাও দায়ের করা হয়। কিন্তু ঠিক যে উপলক্ষে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয় সেটি সম্পূর্ণ একটি আলাদা ব্যাপার। ডালহাউসি স্কোয়ারের হলওয়েল মনুমেনটটি অপসারণ করার দাবিতে এই সময় ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করা হয়। বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল কংগ্রেস কমিটির সেকরেটারি রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব সরকারের কাছে এটি অবিলম্বে অপসারণ করার জন্য লিখিতভাবে আবেদন করেন এবং সেই সঙ্গে এও জানিয়ে দেন যে, দাবি পূরণ না হলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আগামী ৩ জুলাই ১৯৪০ থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করা হবে। সরকার এই দাবি মেনে নেননি এবং হাঙ্গামা এড়ানোর ভয়ে শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকেই গ্রেপ্তার করলেন।

জেলের জীবন সুভাষচন্দ্রের অপরিচিত নয়। ইতিপূর্বে প্রায় এগারোবার তাঁকে জেলে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এইবারে, ইতিহাসের এইরকম একটি বিরল মুহূর্তে, সুভাষচন্দ্রের মনে হল যে, কারাগারে বন্দী হয়ে রইলে তাঁর পক্ষে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সযোগ গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। ভারতরক্ষা আইনের বলে তাঁকে বিনা বিচারে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত

সরকার আটক রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অথচ এই সময় তিনি বাইরে থাকতে পারলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নানারকম ভাবে প্রস্তুতি করতে পারতেন। সুভাষচন্দ্র ক্রমেই অধীর হয়ে উঠছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য আবারও ভাঙতে আরম্ভ করছে কিন্তু সেদিকে তাঁর নজর নেই। তিনি এবং তাঁর জেলবন্দী সঙ্গীরা কিভাবে অবিলম্বে মুক্তি পাবেন, এই ছিল তাঁর সেই সময়কার একমাত্র চিন্তা। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে, মুক্তিলাভ না করা পর্যন্ত তাঁরা সকলে একযোগে জেলের ভিতরেই আমরণ অনশন সংগ্রামে লিপ্ত হবেন বলে মনস্থ করলেন।

সুভাষচন্দ্রের নিজের লেখায় কোথাও এই অনশন সংগ্রাম সম্পর্কে বিশেষ কিছু সংবাদ পাওয়া যায় না। তাঁর Collected Works-এর দ্বিতীয় খণ্ডে শুধু এইটুকু খবর পাওয়া যায় যে, অনশন শুরু করার আগে সুভাষচন্দ্র সরকারকে এই মর্মে একটি হুঁসিয়ারি দিয়ে জানান যে, তাঁকে এভাবে বন্দী করে রাখার কোন নৈতিক অধিকার সরকারের নেই এবং তাঁকে মুক্তি না দেওয়া হলে তিনি আমরণ অনশন শুরু করবেন। অর্থাৎ জীবিত বা মৃত যেভাবেই হোক না কেন তিনি কারাপ্রাচীরের বাইরে আসতে সঙ্কল্পবদ্ধ।

এই হুমকির ফলে সরকার যারপরনাই বিচলিত হয়েছিলেন। সরকারের দপ্তরে সম্প্রতি কিছু গোপন নথিপত্র খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তার থেকে জানা যায় যে, সুভাষচন্দ্রের এই হুঁসিয়ারির চিঠি পেয়ে তাঁরা ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে দিয়েছিলেন। বাংলা সরকারের অতিরিক্ত সচিব A E Ponter ২১ এবং ২৩ নভেম্বর ১৯৪০ তারিখে পর পর দুটি গোপন আদেশনামা প্রচার করে জানালেন যে, সুভাষচন্দ্র এবং অন্যান্য বন্দীরা জেলের অভ্যন্তরে নানারকম অন্যায় এবং অসদাচরণ সম্পর্কে জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ এনেছেন, সেগুলি সরকারের নিতান্তই অমূলক বলে মনে হয়েছে। সরকার যদিও প্রতিটি বন্দীর অভিযোগ সুযোগমত আলাদা করে খুঁটিয়ে দেখতে রাজি আছেন, তবু এ কথাও সত্য যে, তাঁদের পক্ষে এখনই সকল শ্রেণীর বন্দীকে ঢালাওভাবে উচ্চ শ্রেণীর রাজবন্দী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। একই সঙ্গে সরকার আরও একটি চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা সুভাষচন্দ্র যে কী পরিমাণ জনপ্রিয় নেতা ছিলেন তা খুব ভাল করেই জানতেন। সুতরাং অনশনের ফলে তাঁর যদি স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং সেই খবর যদি জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে দেশ জুড়ে যে ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হবে তার সামাল দেওয়া সরকারের পক্ষেও অসম্ভব হয়ে উঠবে এটা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই সাবধানে এগনোর পক্ষপাতী ছিলেন। সুভাষচন্দ্র ও কারান্তরালবর্তী অন্যান্য রাজবন্দীগণের অনশন সম্পর্কিত কোন সংবাদ যাতে খবরের কাগজ এবং অন্য কোন ছাপানো পত্রের মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রচারিত না হয় এজন্য তাঁরা সরকারি নির্দেশনামা জারি করলেন। ভারত সরকারের অতিরিক্ত সচিব R Tottenham ২৪ অকটোবর ১৯৪০ তারিখে এ সম্পর্কে প্রথম আদেশটি প্রচার করেন। একমাস পরে বাংলা সরকারের অতিরিক্ত সচিব A E Ponter-এর স্বাক্ষর সম্বলিত ঐ একই আদেশ-নামা (নং 7009P তাং 25.11.1940) কলকাতা গেজেটে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়। নতুন আদেশনামায় শুধু যে প্রস্তাবিত অনশন সম্পর্কিত সংবাদ প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তাই নয়, একই সঙ্গে এ ব্যাপারে জনমত সংগঠন করার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার শোভাযাত্রা, মিছিল, সমাবেশ এবং বক্তৃতাও নিষিদ্ধ করা হয়।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিটি প্রচারিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক সভায় এই কালা কানুনটি চ্যালেনজ করে ২৬ এবং ২৭ তারিখে তিনটি মুলতুবি প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হয়। প্রস্তাবের মোশান এনে-ছিলেন সৈয়দ জালালউদ্দিন হাসামি, নলিনাক্ষ সান্যাল এবং নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার। শ্রী সান্যালের প্রস্তাবে মোশানের কারণটি বর্ণনা করে একটি সংক্ষিপ্ত লিখিত বিবৃতি পেশ করা হয়। সেখানে বলা হয় যে, সম্প্রতি ভারতরক্ষা আইনের বলে ব্যবস্থাপকসভার কয়েকজন সদস্যসহ যে কয়েকজন সুপরিচিত জননেতাকে আলিপুর প্রেসিডেনসি ও দমদম সেনট্রাল জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে, তাঁদের সদ্য ঘোষিত অনশন সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত 'যাবতীয় সংবাদ সরকারি সূত্র ব্যতীত অন্য কোনভাবে প্রচার করা যাবে না বলে সরকার কলকাতা গেজেটের একটি একসট্রা - অরডিনারি সংখ্যায় অধুনা যে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করেছেন, তার বৈধতা নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক এবং এই জন্য ব্যবস্থাপক সভার বর্তমান আলোচনাসূচী মুলতুবি রাখার প্রস্তাব করা হচ্ছে। সভার স্পিকার আবদুল হাকিম, শ্রী সান্যাল ও শ্রী দত্ত মজুমদারের মুলতবি প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সৈয়দ হাসামির প্রস্তাবটি কোন এক বিচিত্র কারণে অগ্রাহ্য করা হয়।

সে যাই হোক প্রসঙ্গটি সে সময় তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করে। সরকারের সমস্ত চাপাচাপি সত্ত্বেও জেল থেকে খবর পাচার হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র অনশন শুরু করেছিলেন ২৯ নভেম্বর তারিখে এবং তার চব্বিশ ঘণ্টা পর থেকেই তাঁর স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি ঘটতে লাগল। তিনি বমি করতে আরম্ভ করে-ছিলেন। কিন্তু সরকার জোর করে তাঁকে খাবার খাওয়ানোর চেষ্টা করতে ভয় পেলেন, কেননা তার ফলে জনমানসে বৃহত্তর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। অবশেষে সুভাষচন্দ্রেরই জয় হল। সরকারি আমলারা এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে স্থির করলেন যে, এমতাবস্থায় প্রশাসনিক বিপর্যয় এড়ানোর জন্য সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দেওয়াই শ্রেয় এবং সেইমত বৃহস্পতিবার ৫ ডিসেমবর তারিখে তাঁকে মুক্তি দিয়ে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় অ্যামবুলেনসে করে এলগিন রোডে নিজ গৃহে ফিরিয়ে আনা হল। মুক্তি সম্পর্কে কোন সংবাদ আগে প্রচারিত না হলেও এক বিপুল জনতা জেল থেকে ফেরার সময় সুভাষচন্দ্রকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করে।

ইংরাজের জেলে সুভাষচন্দ্রের সেই শেষ অন্তরীণ দশা এবং সেবারের মত সেই হল তাঁর শেষ প্রত্যাবর্তন। ২৬ জানুয়ারি ১৯৪১ তারিখে তাঁর ঐতিহাসিক অন্তর্ধান।□

আলোকচিত্র :
নেতাজী রিসারচ ব্যুরোর সৌজন্যে

সমস্যা ?

মোটেই না ! গর্ভপাত এখন তো বৈধ। আপনি সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক কারনে সুবিধাটি নিতে পারেন। অবিবাহিতা হলেও ! অবশ্য অপ্রাপ্তবয়স্কার অভিভাবক প্রয়োজন ! খরচ ? প্রাথমিক ক্ষেত্রে ১১০ টাকা। নিরাপত্তা–গোপনীয়তার প্রতি–শ্রুতি ! থাকারও ব্যবস্থা। পরা–মর্শ বিনাব্যয়ে। রবিবারও (খোলা)

—আপনার সমস্যায় আমরাই সমাধান !

সরকার অনুমোদিত সংস্থা
পরিবার কল্যান কেন্দ্র
১৭/১ বি বালিগঞ্জ স্টেশন রোড কলি-১৯

মূল প্রতিযোগিতার চেয়ে বেশি দর্শক টেনেছে

নয়া দিললি থেকে কলিন পাল

নামকরা এক চলচ্চিত্র সমালোচক বললেন 'আমাদের দেখা ন'টা 'উৎসবের মধ্যে এটা সবচেয়ে বিবর্ণ, তৃতীয় দিন একথা বলা মানে তা ভেবে দেখার মত।

চলচ্চিত্র উৎসবের পরিচালকমণ্ডলী ক্যাবরলের ছবির প্রদর্শন সময় পরিবর্তন নিয়ে যে যাচ্ছেতাই রকমের সমালোচনা হয় তার উত্তরে এক প্রেস নোট জারী করে জবাবদিহি করেন। তারা জানান ফরাসি ফিলম দ্বিতীয় অংশে এবং সাধারণ দর্শকের জন্য দুপুরে দেখানোর কথা থাকলেও তা আগেই দেখানো হয়। হিন্দুস্থান টাইমস এই প্রেস নোটকে কোন পাত্তা দেয়নি এবং সংবাদপত্রের অন্যরা তো রীতিমত মজাই পায়। এটাকে যদি আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বলেই হয় তাহলেও এতে আমলাতান্ত্রিক অপদার্থতা একেবারে পরিষ্কার। সমালোচকদের বলা হয়েছে, তাদের সুবিধার্থে ছবিটি পরে আবার দেখানো হবে।

ইনডিয়ান প্যানোরামার পৃথক উদ্বোধন হবার ফলে সেই অবস্থার একটু পরিবর্তন হয়েছিল এবং বিদেশি প্রতিনিধিরা এটিই বেশি পছন্দ করেছেন। বাংলাদেশের একটি ছবি প্রতিযোগিতামূলক ভাবে যখন দেখানো হচ্ছিল তখন আলাপ হল সুইজারল্যানডের টিভি প্রযোজক জিনডারের সঙ্গে। তিনি বললেন, মণ্ডলংকর হল-এ প্যানোরামার সব ছবিই তিনি মোটামুটি দেখবেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রের বর্তমান ধারাই শুধু তিনি বুঝতে চান কেন না পশ্চিমী ও জাপানী ছবি তার দেশে বসেই দেখার প্রভূত সুযোগ রয়েছে।

কমিটির চেয়ারম্যান বাসু ভট্টাচার্য ইনডিয়ান প্যানোরামার উদ্বোধন করলেন। তারা ঐ শাখার জন্য কুড়িটি ছবি বাছাই করেছেন। তিনি বললেন, চূড়ান্ত নির্বাচনের আগে দুশোটিরও বেশি ছবি দেখেছেন। প্যানোরামায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাঁচটি ছবি আছে। 'দুলিয়া' 'গৃহযুদ্ধ' তার মধ্যে অন্যতম। এবং 'চোখ' প্রথমে এই শাখায় ছিল পরে তা ভারতীয় সরকারি অংশগ্রহণকারী হিসাবে স্থান পেয়েছে। বাসু চ্যাটারজি ও বাসু ভট্টাচার্য দুজনেই এ ছবি সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদী। তাদের আশা এ ছবি উচ্চতম পুরস্কার পাবে। উদ্বোধনের পর আদুর গোপালকৃষ্ণের ,এলিপপাথিয়ম (ইঁদুরকল) প্রদর্শিত হয়েছে।

প্রথম তিনদিন অন্তত তিনটি অসাধারণ ছবি দেখানো হয়েছে। আমোক, উজ লাইফ ইজ ইট এনিওয়ে এবং হোয়াইট এই তিনটিই তথ্য শাখার। দ্বিতীয় ছবিটি প্রকৃতপক্ষে

প্রদীপ জালিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার প্রতিমন্ত্রী এন কে পি সালভে। পাশে দীপ্তি নাভাল

সাঈ পরাঞ্জপে পরিচালিত 'কথা' ছবির একটি দৃশ্য

ইনডিয়ান প্যানোরামাই

9 iffi নবম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

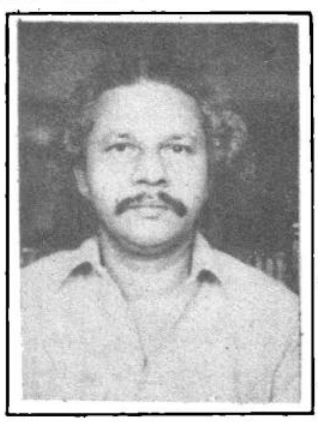

আদুর গোপাল কৃষ্ণন

কনরাড উলফ পরিচালিত 'মামা, আই অ্যাম এলাইভ'

একজনের কথাকীর্তি, যে অভিনয়টি করেছেন রিচারড ড্রেফাস। নিদারুণ রোগে জর্জরিত রোগীকে মরতে দেওয়া উচিত কিনা এই জলজ্যান্ত সমস্যাই এ ছবির বিষয়বস্তু। অসাধারণ স্পর্শাত কেন হ্যারিসন এক মোটর দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ প্যারালাইজড হয়ে যান এবং অতিলৌকিক চেষ্টায়ও তা সারার কথা নয়। জ্ঞান তার যথারীতি রয়েছে, কথাবার্তা একেবারে পরিষ্কার, মাথাটাও এদিক ওদিক ঘোরাতে পারেন। ডাক্তারের ভূমিকায় প্রখ্যাত পরিচালক জন কাসাভিটিজ অভিনয় করেছেন। রোগীকে তিনি সরাসরি বললেন, ভাগ্যই তার মেনে নেওয়া উচিত। হ্যারিসন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, চেষ্টা করে সব ওষুধপত্র না খেতে এবং বলতে থাকে জড় হয়ে থাকার চেয়ে সে মৃত্যুকেই বরং মেনে নেবে। ডাক্তার নৈতিকভাবে শেষ পর্যন্ত লড়ে যেতে চান কিন্তু পারেন না, তখন তা আইনের আওতায় গিয়ে পড়ে। হ্যারিসন আবেদন করে যে সে নিজের জীবন নষ্ট করবে না তবে হাসপাতাল থেকে যেন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় সেই আবেদন জানায়।

ছবিটি করুণাজনক হত্যার সপক্ষে এমন নয়, তবে রিচারড ড্রাইফাস নির্দ্বিধায় আইনের মিথ্যাচারিতার কথা এতে বলেছেন। তিনি এমন দারুণ অভিনয় করেছেন যে হলিউডের অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যানড সায়েনসের-এ বার্ষিক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কারের প্রতিযোগিতায় তিনিই ছিলেন বিন কিংসলের রীতিমত শক্তিশালী প্রতিযোগী।

হোয়াইট রোজ (পশ্চিম জারমান পরিচালক মিখাএল ভেরহুভেন) দেখানোর সময় দর্শক বেশি ছিলেন না। এটি চলেছে দু'ঘণ্টারও বেশি। ছবিটি সম্পর্কে আগে বিশেষ কিছু শোনা যায়নি। যুদ্ধের সময় নাৎসী শাসন, তার অত্যাচার এবং সেই শাসনের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র-ছাত্রীর প্রতিরোধই এ ছবির বিষয়বস্তু। বাস্তবিকই তারা চিন্তা করতে পেরেছিল যে অত্যাচার একদিন শেষ হবেই। ছাত্র, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য সমর্থকদের মধ্যে তারা হিটলার ও তার দলবলের বিরুদ্ধে মতামত গড়ে তোলার জন্য তা সাইক্লোস্টাইল করা প্যামফ্লেটে ছড়াত। মূল চরিত্র শোফির ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেন তরুণ অভিনেত্রী লেনা স্টেটালজে। তার ভাই প্যামফ্লেটগুলি লেখে। তার একটা হতচকিত ভয় ছিল যে ভাই যেকোন মুহূর্তে গেসটাপোর হাতে পড়তে পারে। কিন্তু নিজেই একদিন সেই গোষ্ঠীতে জড়িয়ে গেল। আর গুপ্ত পুলিশের হাত থেকে কারই বা মুক্তি আছে।

উৎসবের প্রথম দুদিনে চারটি ছবি প্রতিযোগিতায় দেখানো হয়েছে। শ্রীলঙ্কার বসন্ত ওবে-সকারা পরিচালিত দ্য হানট, পশ্চিম জারমানের রিচারড ইউফ পরিচা-লিত ম্যান অন দ্য ওয়াল, চেকোস্লোভাকিয়ার ভ্যাকলাব মাতাজকে-র ইন লাভ উইথ ইয়াকুব এবং বাংলাদেশের পরিচালক সৈয়দ হুসান ইমামের একটি ছবি। কোনটিকেই উৎসবের মান সমৃদ্ধ বলা যায় না। বাংলাদেশের ছবিটির বাছাই দেখে মনে হয় এটি অপেশাদারি এবং জঘন্য টেকনিক্যাল অকাজে ভর্তি। সরকারই এর প্রযোজক এটা দেখে মনে হয় রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য এর থাকলে থাকতেও পারে।

বহু আলোচিত ছবি অরডিনারি পিপল শুরু হয় রাত নটায়। ১২৫ মিনিটের এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন চলচ্চিত্রাভিনেতা রবারট রেড ফোরড। মাঝরাত হয়ে যাবে বলে এমন আবশ্যিক ছবিটা আমরা দেখতে পেলাম না। কারণ অত রাতে সিরি ফোরড ফিরে যাওয়া রীতিমত কষ্টসাধ্য কিন্তু এই হতাশা এবং অব্যবস্থা উৎসবের অঙ্গ বলেই আমরা মেনে নিয়েছিলাম। □

আলোকচিত্র : প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর সৌজন্যে

ইউ এস এ-র ছবি 'টাচড বাই লাভ'-এর একটি দৃশ্য

লেখক বিগত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেনটের অধ্যাপক। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিতে ক্রমাগত লোকসানের কারণ অনুসন্ধান করেছেন লেখক। দেখিয়েছেন জন্মগত প্রযৌক্তিক দুর্বলতা নিয়েই রাষ্ট্রীয় শিল্পগুলি জন্মগ্রহণ করছে।

সরকারি কারবারে ক্রমাগত লোকসানের জন্য দায়ী কারা ?

অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্রুত আয়তন বৃদ্ধি

ভারতবর্ষে সরকারি কারবারের ক্ষেত্র ক্রমশ আয়তনে বেশ বড় হয়ে উঠছে। ১৯৮০ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কারবারের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮৯টি। প্রথম যোজনার শুরুতে এই সংখ্যা ছিল ৫টি। (সারণি-১)

তবে সরকারি কারবারের আয়তন যতটা বেড়েছে গুণগত মান বা আভ্যন্তরীণ শক্তি ততটা বাড়েনি। বরং এখনও অধিকাংশ সরকারি কারবার তাদের নাবালকত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি তাই জনসাধারণের মনে এ প্রশ্ন জেগে ওঠা স্বাভাবিক যে এত বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে, যার পরিমাণ গড়ে জন সংখ্যার মাথা-পিছু ৩০০ টাকার মতন, কী ফল পাওয়া গেল ? কত ধানে কত চালই বা মিলল ?

লাভের চেয়ে লোকসান বেশি

যে সমালোচনা আজ সর্বত্র মুখর তা হল যে এত মূলধন, নানা রকমের সুযোগ-সুবিধা এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রায় একচেটিয়া অধিকার থাকা সত্ত্বেও সরকারি কারবারগুলি ঠিকমত লাভ দেখাতে পারছে না। সামগ্রিকভাবে এগুলিতে লাভের বদলে লোকসানই হয়ে আসছে। ১৯৬৮-৬৯ থেকে ১৯৭৮-৭৯ এই দশ বছরে সরকারি কারবারগুলিতে লোকসানের মোট পরিমাণ বেড়ে ৩৪৯ কোটি টাকা থেকে দাঁড়িয়েছে ১৮৬৭ কোটি টাকা। ১৯৭৮-৭৯-তে লোকসানের পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি টাকা, তা বেড়ে ১৯৭৯-৮০-তে দাঁড়িয়েছিল ৭৪ কোটি টাকা এবং ১৯৮০-৮১-তে ১৮২ কোটি টাকা। তবে সবকটি কারবার যে লোকসানে চলছে এ কথা বলা চলে না। বিশেষ করে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য হারে তাদের লাভের পরিমাণ বাড়াতে পেরেছে। (সারণি-২)

অপরপক্ষে কতকগুলি বড় সংস্থা কয়েক বছর ধরে বেশ লোকসানে চলে আসছে। (সারণি-৩-৪)

সরকারি সংস্থাগুলির হিসাব একত্র করলে লোকসানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১৯৭৮-৭৯-তে ৪০ কোটি টাকা, ১৯৭৯-৮০-তে ৭৪ কোটি টাকা এবং ১৯৮০-৮১-তে ১৮২ কোটি টাকা।

হলদিয়া তেল শোধনাগার / আলোকচিত্র : [illegible]

এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে ১৯৭২-৭৩ সন থেকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার বেশ উঁচু হয়ে আসছে এবং ১৯৭৫ সনে জরুরি অবস্থা চালু হয়েছিল। ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ পর্যন্ত লোকসানের চেয়ে লাভের মাত্রা যে বেশি ছিল তার পিছনে ছিল এই দুটি ঘটনার প্রভাব।

এ কথা ঠিক যে গোড়ার দিকে সরকার পক্ষ থেকেই সরকারি কারবারে লাভের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, কিন্তু পরবর্তীকালে একের পর এক কমিটি বা কমিশন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণও প্রতিটি সরকারি কারবার যাতে লাভে চলে সে কথা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন। বিশেষ করে ১৯৫৯ সনে উটিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি আলোচনা চক্রে এ নীতি স্বীকৃত হয় যে সরকারি কারবারগুলিকে লাভজনক হতে হবে এবং জাতির অর্থনৈতিক বিকাশ সাধনে অর্থ যোগাতে হবে। তাই তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে বিভিন্ন পরিকল্পনায় অর্থ সংস্থানের একটি প্রধান উৎস ছিল সরকারি কারবার সমূহের উদবৃত্ত। সেদিক থেকে কিন্তু কোন পরিকল্পনাতেই এ কারবারগুলি আশানুরূপ অর্থ সরবরাহ করতে পারেনি।

অন্যান্য লক্ষ্য পূরণে বিফলতা

সরকারি কারবারগুলি তাদের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। (১) এগুলি যথেষ্ট পরিমাণে জনসাধারণের উপভোগ্য পণ্য উৎপাদন করতে পারেনি। বরং সরকার অধিগ্রহণ করার পর সংশ্লিষ্ট পণ্যের দাম বেশ বেড়ে গেছে। বিশেষত কয়লার দাম যে ভাবে বেড়েছে, যদি কোন বেসরকারি কারবারের ক্ষেত্রে এমন ঘটত তাহলে সরকার তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি বিধান করতেন। (২) এ কথা সত্য যে সরকারি কারবার অনেক বেশি সংখ্যায় চাকুরি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৬০ থেকে ১৯৮০ এই ২০ বছরে অতিরিক্ত চাকরি সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ৮০/৯০

সারণি-১

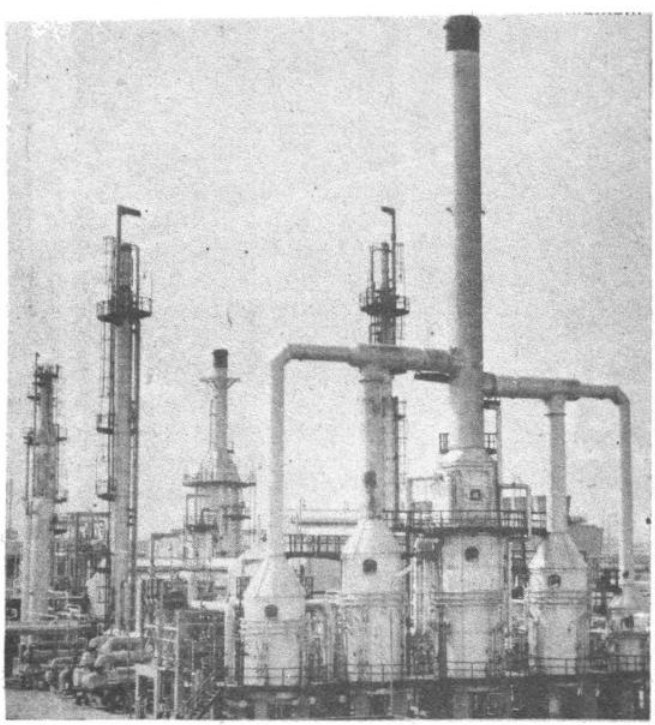

ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বৃদ্ধি

	কেন্দ্রীয় সরকারি কারবারের মোট সংখ্যা	মোট লগ্নীকৃত মূলধনের পরিমাণ (কোটি টাকা)
প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুতে	৫	২৯
দ্বিতীয় " " "	২১	৮১
তৃতীয়	৪৮	৯৫৩
চতুর্থ	৮৫	৩৯০২
পঞ্চম	১২২	৬২৩৭
১৯৭৯-র ৩১ মারচ তারিখে	১৭৬	১৫৬০২
১৯৮০-র	১৮৯	১৭০০০

(যোজনা, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৮১)

সারণি-২

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে নীট লাভের পরিমাণ (কোটি টাকা)

	১৯৭৫-৭৬	১৯৭৬-৭৭	১৯৭৭-৭৮	১৯৭৮-৭৯
ONGC	২৪ ৪১	৩৮.০২	৫১·৭২	৭২·৫২
IOC	২৯·৯১	৪৮·৪১	৪৯·২৪	৬৯·২০
Air India	৬·৩৫	১৭·৫৯	২৮·৪৫	৩৪·০৯
BHEL	২৫·০৪	২৮·১২	২৫·৫২	২৫·১৫
Madras Fertilisers	২·২০	৩·২৬	১১·৫৮	১৮·১৫
MMTC	৮·৮৩	১৬·৬৭	১৭·০২	১৬·৭৫
STC	৫·৭০	১৪·৮০	১২·৯৩	১৩·৬৪

লক্ষের মতন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে দেখা যায় যে অধিকাংশক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে। সরকারি সংস্থায় উৎপাদিকা-শক্তির (productivity) হার নীচু থাকার এ একটি কারণ। (৩) সরকারের কারবার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হওয়ার আর একটি লক্ষ্য ছিল শিল্পক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা। কিন্তু নিচের তালিকা থেকে দেখা যাবে যে সরকার কর্তৃক বেশি মূলধন বিনিয়োগ ঘটেছে কয়েকটি উন্নততর রাজ্যে আর কয়েকটি রাজ্য যে

সারণি-৩

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে লোকসানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

	১৯৭৫-৭৬	১৯৭৬-৭৭	১৯৭৭-৭৮	১৯৭৮-৭৯
1. Coal India	২৭·৯	৩১·২	৮৩·৬	২১২·২
2. Shipping Corporation of India			১৪·১	৩৬·৩
3. Indian Iron & Steel Company	৬·৭	১৪·৫	৩৯·৮	২৭·২
4. Fertilizer Corporation of India	২৪·৪	৩৪·৪	৬৭·২	১৫·২

তিমিরে ছিল প্রায় সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।(সারণি-৫)

(৪) আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারি কারবারগুলি ভারতবর্ষের অর্থ-নৈতিক কাঠামোতে আরও জটিলতার সৃষ্টি করেছে ও বৈষম্য বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষে বহু বছর ধরে dual economy বা দ্বৈত অর্থনীতি চলে আসছে। অর্থনৈতিক কাঠামোর একটা অংশ দুর্বল ও পশ্চাৎপদ যেমন কৃষিক্ষেত্র, ক্ষুদ্র শিল্প এবং কতকগুলি অপটু, পরিবারকেন্দ্রিক বৃহৎ শিল্প ; অপর অংশটি উন্নত ও প্রগতিশীল যার মধ্যে পড়ে প্রায় সমস্ত পূর্বতন বিদেশী কারবারী সংস্থা এবং কয়েকটি সুপরিচালিত দেশীয় কারবার। প্রথম-টিতে যারা কর্মরত তাদের বেতনের হার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সীমিত। দ্বিতীয়টির শ্রমিক সাধারণের আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল। সরকারি কারবারের কর্মচারীদের অবস্থা সাধারণ ভাবে দ্বিতীয় অংশের সামিল। বিশেষত্ব একটি সরকারি সংস্থায় (L I C) বেতন ও সুযোগ-সুবিধা এরূপ মাত্রা ছাপিয়ে গিয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮১-র ফেব্রুয়ারিতে অর্ডিন্যান্স জারি করে তা নিয়ন্ত্রিত করতে হয়েছে। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে ধনবৈষম্য আরও বেড়ে গেছে যে কারণে সরকারি কারবার সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Public Undertakings) একবার মন্তব্য করেছিলেন যে এ কারবারগুলি হল দারিদ্র্যের মাঝে সম্পদের আতি-শয্য (islands of prosperity in the sea of poverty).

ব্যর্থতার কারণসমূহ

সাধারণভাবে সরকারি কারবারের ব্যর্থতার কারণগুলি চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে : (ক) জন্মগত ও প্রযৌক্তিক, (খ) আর্থিক ও অর্থ-নৈতিক, (গ) ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত এবং (ঘ) রাজনৈতিক।

(ক) জন্মগত ও প্রযৌক্তিক দুর্বলতা —(১) সরকার যে সমস্ত শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন, তাদের অধিকাংশই মৌলিক ও ভারি যেমন ইস্পাত, ভারি শিল্প, শক্তি উৎপাদন। এগুলিতে অনেক মূলধন লাগে এবং এগুলি অনেক বছর কেটে গেলে তবে লাভ-জনক হয়। যদিও ইতিমধ্যে কয়েকটি এজাতীয় শিল্প সংস্থার বেশ বয়স হয়েছে, অবিরাম মুদ্রাস্ফীতি এবং কর্মচারীগণের প্রায়ই বেতনবৃদ্ধি এদের লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনাকে সুদূর পরাহত করে তুলেছে।

(২) অনেক বেসরকারি শিল্প সংস্থা সম্প্রতি তাদের পণ্যসামগ্রীর বিচিত্রকরণ (diversification) করে শুধু যে তাদের কার্যক্ষেত্রকে বিস্তৃত করেছে তা নয়। তাদের গড় লাভের হারও বজায় রাখতে বা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সরকারি কারবারের পক্ষে এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

(খ) আর্থিক ও অর্থনৈতিক গলদ— (১) অনেক সরকারি কারবারে আবার যত মূলধন প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি মূলধন বিনিযুক্ত (overcapitalised) আছে। 'গৌরীসেনের টাকা' বলে অর্থ সমাগমে অসুবিধা হয়নি। এগুলিতে উৎপাদন ক্ষমতা যে পূর্ণ-মাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে না, স্থায়ী মূলধন ও যন্ত্রপাতির আতিশয্যতাও একটা প্রধান কারণ। (২) সরকারি কারবারের আর একটা বড় অসুবিধা হল যে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যাঁদের ওপর ন্যস্ত আছে তাদের নিজস্ব কোন আর্থিক ঝুঁকি নেই যা অধিকাংশ বেসরকারি কারবারে আছে। (৩) তাছাড়া, ঠিকমত বাজার অনুসন্ধান, চাহিদা অনুমান,

সারণি-৪

চালু সংস্থাগুলির নীট লাভ ও নীট লোকসানের পরিমাণ

(কোটি টাকা)

বছর	নীট লাভ	নীট লোকসান	ফলাফল
১৯৬৯-৭০	৬৭·৬	৭৬·৪	— ৮·৮
১৯৭০-৭১	৭৪·৯	৭৮·৩	— ৩·৪
১৯৭১-৭২	৯৯·৩	১১৮·৫	— ১৯·২
১৯৭২-৭৩	১০৪·৫	৮৬·৭	+ ১৭·৮
১৯৭৩-৭৪	১৬০·৮	৯৬·৩	+ ৬৪·৫
১৯৭৪-৭৫	৩২২·৩	১৩৮·৮	+ ১৮৩·৫
১৯৭৫-৭৬	২৫৫·১	১২৬·০	+ ১২৯·১
১৯৭৬-৭৭	৩৯৪·৪	২১০·৫	+ ১৮৩·৯
১৯৭৭-৭৮	৩৮৪·৯	৪৭৫·৯	— ৯১·০

সারণি-৫

বিভিন্ন রাজ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে বিনিযুক্ত (কোটি টাকা) মূলধনের পরিমাণ

রাজ্য	৩১।৩।৬৯	৩১।৩।৭৯
বিহার	৬২১·২	২৮৭৭·০
মধ্যপ্রদেশ	৫৪৩·২	১৮৪৬·১
পশ্চিমবঙ্গ	৪১১·৪	১০৮২·৯
মহারাষ্ট্র	১০০·৯	৯৭৬·৬
গুজরাট	৮৬·৭	৭৬২·২
উড়িষ্যা	৪২৩·২	৭১০·৩
উত্তরপ্রদেশ	১৩৭·০	৬৫৮·১
তামিলনাড়ু	২৬২·২	৬১৫·৮
কর্ণাটক	৭৯·৬	৫২৯·৮
অন্ধ্রপ্রদেশ	৮৬·৯	৫১৩·৯
দিল্লি	১২·০	৪২৭·৮
আসাম	৬৪·১	৩৮২·৭
কেরালা	১০১·৪	৩৮২·৭
পানজাব	৩২·৬	৩৪৪·৫
রাজস্থান	২৭·২	২৯২·০
হরিয়ানা	৭·১	২১৩·৯
হিমাচল প্রদেশ	১·৭	১০৭·৬
জম্মু ও কাশ্মীর	—	৬·২
গোয়া	—	৫·৪
অনির্দিষ্ট ও অন্যান্য স্থান	৪৬৪·৭	২৯০২·৫
মোট	৩৪৬৩·১	১৫৬৬৮·০

(উৎস : Public Enterprises Survey, ১৯৭৮-৭৯, ১ম খণ্ড)

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ইত্যাদির অভাবে অনেক সরকারি কারবারে মজুত পণ্যের (inventory) ভার বেশ গুরুতর। সরকারি কারবার-সংক্রান্ত একটি সমীক্ষক দল একবার দেখেছিলেন যে ৫টি নাম করা সংস্থায় মজুত পণ্যের পরিমাণ ছিল দুবছরের মোট উৎপাদনের সামিল এবং আরও পাঁচটিতে এ পরিমাণ ছিল এক বছরের মোট উৎপাদনের বেশি (Report of the Study Team on Public Undertakings, জুন, ১৯৬৭) R. Prakash ৮৮টি সরকারি শিল্প সংস্থার ১৯৬৬-৭৬ এই দশ বছরের উৎপাদন অনুসন্ধান করে এবং Bureau of Public Enterprises এর মজুত নিয়ন্ত্রণ কমিটি ২৮টি সংস্থার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছিলেন যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিতে অতিরিক্ত মজুতের হার শতকরা ১৪ থেকে ৭১ ভাগের মধ্যে অর্থাৎ গড়ে ৩৯ ভাগের মত ছিল (Lok Udyog, ডিসেম্বর, ১৯৭৮ ও জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯)। (৪) সরকারি সংস্থায় ব্যয় নিয়ন্ত্রণের দিকে আদৌ লক্ষ্য দেওয়া হয় না বললেই হয়। লোকসভার সরকারি কারবার সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির মতে ১৯৭৪-৭৭ এই তিন বছরে ৪১টি সংস্থার বিনোদন (entertainment) খাতে ব্যয় অত্যধিক হয়েছিল ; তাদের মধ্যে ১৩টিতে ব্যয়ের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকার বেশি ছিল এবং ৬টিতে

একটুখানি ন্যাটের ছোঁয়ায়
জামা কাপড়ের রূপ খুলে যায়

ন্যাট

পলিব্যাগ
প্রতি কিলোতে
২টাকা
বাঁচায়

রঙও হাসে, কাপড়ও বাঁচে, সাদা হয় আরও সাদা

A Kusum Product

C82.31B

বিজ্ঞাপন ও প্রচার বাবদ ব্যয় ১০ লক্ষ টাকার বেশি ছিল। (৫) অপরদিকে যে সমস্ত কারবার ধারে পণ্য বা সেবা বিক্রয় করে, তাদের অধিকাংশতে পাওনা টাকা আদায়ের চেষ্টা খুবই ক্ষীণ। এ কারণে এগুলিতে মোট বিক্রয়মূল্যের একটা মোটা অংশ বহুদিন ধরে অনাদায়ী হয়ে আছে।

(গ) ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি —(১) প্রথমদিকে সরকারি কারবার-সমূহের উচ্চপর্যায়ের ব্যবস্থাপকের পদগুলি civil servant বা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের দিয়ে পূরণ করা হত। যাঁরা সরকারি কোন বিভাগের সচিব বা উপসচিব ছিলেন তারাই সার্বজনিক করপোরেশন বা সরকারি কোমপ্যানির মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ বা উপপ্রধান হয়ে বসতেন। অথচ সরকারি বিভাগ চালানো আর কারবার ব্যবস্থাপনা—এ দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। অনেক সংসদীয় কমিটি ও প্রশাসনিক সংস্কার-সংক্রান্ত কমিশন (Administrative Reforms Commission) এই মর্মে সুপারিশ করেছেন যে যত শীঘ্র সম্ভব সরকারি কারবারের ব্যবস্থাপনা professionalise বা বিশেষ পেশাভুক্ত করতে হবে। সম্প্রতি কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে বটে কিন্তু তবুও এখনও ১৫ থেকে ২০টি সংস্থায় মুখ্য ব্যবস্থাপক পদ সমূহে I A S বা I P S অফিসার এবং ঐ রকম সংখ্যক সংস্থাতেই আবার পূর্বতন সামরিক অফিসার অধিষ্ঠিত আছেন। (২) অপরপক্ষে অনেক সরকারি সংস্থায় সর্বোচ্চ পদগুলি বহুদিন ধরে খালি হয়ে আছে যে কারণে কোন কোন সমালোচক এগুলিকে topless বা মাথাশূন্য আখ্যা দিয়েছেন। ১৯৮১-র আগস্ট মাসে তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর লোকসভায় বিবৃতি অনুযায়ী ঐ সময় সরকারি কারবারসমূহে প্রায় ৭১টি উচ্চপদ খালি ছিল। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই সব কারবারে ব্যবস্থাপনা বিকাশ প্রকল্প (management development programme) বা প্রয়োজনমত যোগ্য ব্যবস্থাপক নিয়োগের পূর্ব প্রস্তুতির বিষয়টি এখনো অবহেলিত। এ ছাড়া, পূর্বেই বলা হয়েছে যে খুব অল্প সংখ্যক সরকারি সংস্থায় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু আছে।

(ঘ) রাজনৈতিক দোষ—(১) সরকারি কারবারের মালিক সরকার। সুতরাং আইন ও নীতির দিক থেকে এর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকা উচিত। এরূপ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য সরকার বা ব্যাপক অর্থে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা। কিন্তু সে নিয়ন্ত্রণ যখন ব্যক্তিগত খামখেয়ালীপনায় পর্যবসিত হয় বা কোন গোষ্ঠীগত স্বার্থের বশবর্তী হয়, তখনই কারবারের সমূহ ক্ষতি। অপরদিকে কারবার ব্যবস্থাপনার একটা স্বাভাবিক নিয়ম হল যে যাঁদের হাতে লাভ-লোকসানের দায়িত্ব ন্যস্ত, দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় তাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে কোন শ্রমিককে সাসপেনড (suspend) করলে কোন মন্ত্রী যদি এক কথায় সে আদেশ নাকচ করে দেন অথবা কোন ব্যক্তিকে কী মূল্যে কত পণ্য সরবাহ করা হবে সে বিষয়ে যদি ওপর মহল থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়, তাহলে অব্যবস্থাপনা চরমে ওঠে। (২) সরকারি কারবার সমূহে শ্রমবিরোধ বা অন্যান্য কারণে নষ্ট হওয়া দিনগুলির সংখ্যা (mandays lost) খুব বেশি। এর মোট সংখ্যা ছিল ১৯৭৭-৭৮ এ ২৫.৫ লক্ষ এবং ১৯৭৮-৭৯ তে ৩৪.৬ লক্ষ। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের সমীক্ষক দলের মতে, 'আদর্শ মালিক'-এর মানে এই নয় যে শ্রমিকগণ যে দাবিই উত্থাপন করবেন তা মেনে নেওয়া হবে অথবা ব্যবস্থাপকগণ শ্রমিক কর্তৃক কাজে ফাঁকি দেওয়া বা বিশৃঙ্খলার কাছে নতি স্বীকার করবেন (রিপোর্ট, জুন, ১৯৬৭)।

কোল ইন্ডিয়ার কয়লা খনি / আলোকচিত্র : অজিত রায়

প্রতিবিধান

সরকারি কারবার নিয়ে এত রকমের কমিটি, কমিশন ইত্যাদি গঠিত হয়েছে ও সুপারিশ করেছে যা বোধহয় অন্য কোন ক্ষেত্রে ঘটেনি। এ'দের রিপোর্টগুলি বিশ্লেষণ করলে তাদের মধ্যে প্রতিবিধানের বহু পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। সরকারি কারবারগুলির সংস্কার সাধন করতে হলে এবং সেগুলি থেকে সুফল পেতে হলে কতকগুলি পদক্ষেপ অত্যাবশক : (১) সর্বপ্রথম প্রয়োজন যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের খালিপদগুলি পূরণ এবং সামগ্রিকভাবে এগুলির ব্যবস্থাপনার Professionalisation বা পেশায় উন্নিত করণ। এ উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেমন I A S-দের জন্য আছে। (২) যাতে ব্যবস্থাপকদের পদগুলি আকর্ষণীয় হয় সেজন্য এ'দের বেতনের হার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। এ বিষয়ে গত কয়েক বছরে কিছু উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বটে, তবে এখনও বেসরকারি সংস্থার তুলনায় সরকারি কারবারির প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপকদের চাকুরির শর্তাবলী সন্তোষজনক নয়। (৩) ব্যবস্থাপকগণ সাধারণভাবে সরকার ও পারলামেনটের কাছে দায়ী থাকবেন বটে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তাঁদের দৈনন্দিন কাজকর্মে যখন তখন বা তুচ্ছ কারণে হস্তক্ষেপ করা চলবে। কারবারগুলির নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য নির্বাহে ব্যবস্থাপকদের স্বাধীনতা (autonomy) থাকবে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে স্থায়ী নির্দেশ জারি করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। (৪) কারবার ব্যবস্থাপনার কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে যেমন বাজারের চাহিদা নির্ণয়, স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন, সম্পাদিত কাজের ধারাবাহিক সমীক্ষা, পণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ, কর্মীদের অনুপ্রেরণা, তাঁদের প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা ইত্যাদি। এগুলি অবিলম্বে চালু হওয়া আবশ্যক। (৫) সম্প্রতি ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলিতে একটি নতুন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে যাকে বলা হয় management audit বা ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষা। সংস্থার বিভিন্ন বিভাগের কর্ণধারদের নিয়ে একটি আভ্যন্তরীণ দল গঠন করা হয় যাঁরা নিয়মিতভাবে প্রতি বছর বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবস্থাপনার কাজ কিরূপ চলছে সম্মিলিতভাবে তা অনুসন্ধান করেন ও ত্রুটি বিচ্যুতি নিরাকরণের কার্যকরী পথ সুপারিশ করেন। এ একরকম যৌথ আত্ম সমীক্ষা। এই সঙ্গে সরকারি কারবারগুলিতে social audit বা সামাজিক নিরীক্ষাও প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন যা ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে দু-একটি সুপরিচালিত বেসরকারি শিল্প সংস্থায় চালু হয়েছে। (৬) সর্বোপরি প্রয়োজন উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির। এজন্য শুধু ব্যবস্থাপকগণই দায়ী থাকবেন তা নয়, সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংঘগুলিকেও (trade unions) অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক শ্রমিকের ন্যূনতম ন্যায্য বেতন পাওয়ার অধিকার আছে যাতে তিনি খেয়ে পরে বাঁচতে পারেন। তেমনি মুদ্রাস্ফীতির দরুন মহার্ঘ ভাতা দেওয়াও কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক দায়িত্ব। কিন্তু এছাড়া, অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পেতে হলে প্রত্যেক শ্রমিককে লক্ষ্যণীয় হারে উৎপাদন বাড়াতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধিতে যে শ্রমিক বা শ্রমিক দলের (work group) যত অবদান সেই অনুপাতে বৈজ্ঞানিক হিসাব নিকাশের ভিত্তিতে তাঁকে বা তাঁদেরকে বোনাস বা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়ার নীতি সর্বস্তরে চালু করতে হবে। পৃথিবীর সব উন্নত দেশেই, কী গণতান্ত্রিক, কী সমাজতান্ত্রিক, অতিরিক্ত পারিশ্রমিক বা বোনাস উৎপাদিকাশক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। □

লোকসানের ডিপো সরকারি দুগ্ধ প্রকল্প / আলোকচিত্র : সলিল রায়

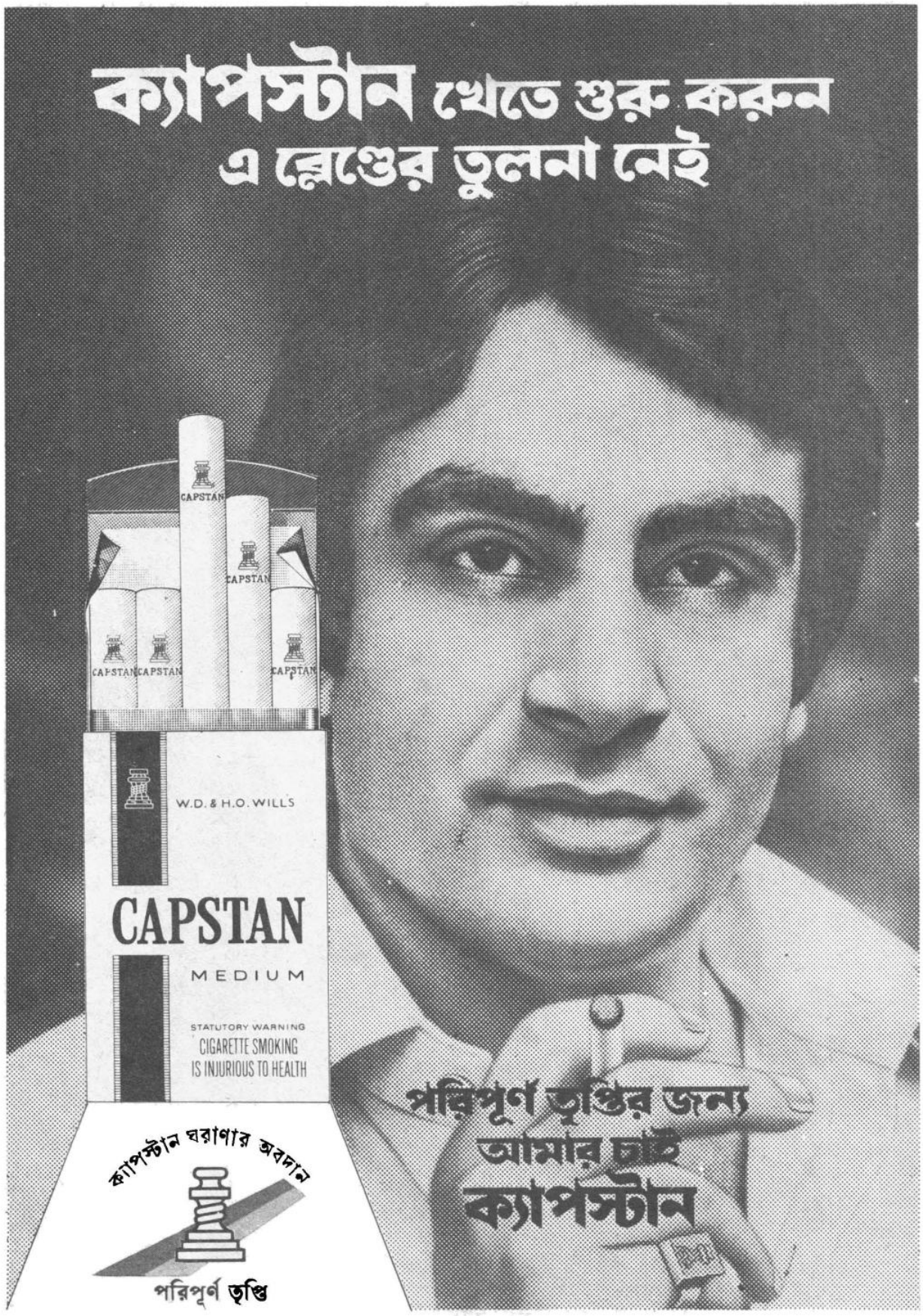

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ: সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর
STATUTORY WARNING CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

CM/CAS-5/82 BEN

আনন্দমঠের ১০০ বছর ঃ বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ কেন বারবার সংশোধন করেছিলেন ?

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগে —১৫ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখে আনন্দমঠ উপন্যাস প্রকাশিত হয়। বঙ্কিম-অনুজ সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গ-দর্শনে আনন্দমঠ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় চৈত্র ১২৮৭—জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯ বঙ্গাব্দে, ১৮৮০-৮২ খৃস্টাব্দে। বঙ্কিমের জীবিতকালে আনন্দমঠের পাঁচটি সংস্করণ হয়েছিল। পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯২ খৃস্টাব্দে। ঠিক দুবছর পরে ১৮৯৪-এর ৮ এপরিল (২৬ চৈত্র ১৩০০ বঙ্গাব্দে) কলকাতায় বঙ্কিমের মৃত্যু হয়। বঙ্কিমের মৃত্যুর বার বছর পরে বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। এর মূলে আছে স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণা, বিশেষত আনন্দ-মঠের প্রেরণা। এ কথা পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা স্বীকার করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৭-এর ১৬ এপরিল তারিখে তা স্বীকার করে লেখেন, 'The earlier Bankim was only a poet and stylist—the latter Bankim was a seer and nation-builder' দ্রষ্টা ও জাতি সংগঠনকারী বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় বিধৃত হয়েছে আনন্দমঠ উপন্যাসে।

অন্যান্য উপন্যাসের মত বঙ্কিমচন্দ্র প্রতি সংস্করণেই আনন্দমঠ উপন্যাসের সংস্কার ও সংশোধন করেছিলেন।

প্রথম ও পঞ্চম সংস্করণ পাশাপাশি রেখে বিচার করলে দেখা যায় উপন্যাসের উপক্রমণিকা ও সমাপ্ত অংশে গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে [দ্রঃ প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্তের 'উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম']।

প্রথম সংস্করণে উপক্রমণিকা অংশে ছিল ঃ

'অন্তশূন্য অরণ্য মধ্যে···'অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত' করে তিনবার প্রশ্ন হল,—'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?' প্রতি প্রশ্ন হল, 'তোমার পণ কি ?'

'প্রত্যুত্তরে বলিল, 'পণ আমার জীবনসর্বস্ব।'

প্রতিশব্দ হইল, 'এ পণে হইবে না।'

'আর কি আছে ? আর কি দিব ?'

তখন উত্তর হইল, 'তোমার প্রিয়জনের প্রাণসর্বস্ব।'

পঞ্চম সংস্করণে পরিবর্তিত পাঠ—

'এ পণে হইবে না'-র স্থলে 'জীবন তুচ্ছ ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।'

'তোমার প্রিয়জনের প্রাণসর্বস্ব'-র স্থলে 'ভক্তি'। সন্দেহ নেই, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে 'ভক্তি' অর্থে বুঝিয়েছিলেন 'আদর্শের প্রতি আনুগত্য ও নিষ্ঠা'।

আনন্দমঠের পরিসমাপ্তি অংশের সঙ্গে এই পরিবর্তিত পাঠের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

সমাপ্তি অংশের প্রাথমিক পাঠ (বা বঙ্গদর্শনেও প্রথম সংস্করণে ছিল) ঃ

মাঘী পূর্ণিমা রাতে মহাপুরুষের আহ্বানের উত্তরে সত্যানন্দ যখন বললেন, '···জ্ঞানে আমার কাজ নাই—আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ইহাই পালন করিব। আশীর্বাদ করুন আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক', তখন—

'মহাপুরুষ।—ব্রত সফল হইবে না—কেন তুমি অনর্থক নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিতা করিতে চাও ? যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর,·····

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, 'শত্রু শোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্য-শালিনী করিব।'

মহাপুরুষ।—'তুমি আর কিছু করিতে পারিবে না—তোমার দুই বাহু ছিন্ন হইয়াছে—তোমারও আর পরমায়ু নাই।'

পঞ্চম সংস্করণে এই অংশের পরিবর্তিত পাঠ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তিত পাঠ ঃ 'ব্রত সফল হইয়াছে—মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ—ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত করিয়াছ।'

এবং 'শত্রু কে ? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।'

উপসংহারের এই পরিবর্তিত পাঠ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এবং তার সূচনা হয়েছে গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই।

এখন প্রশ্ন ঃ বঙ্কিম এ কাজ করলেন কেন ? যতদূর জানা যায়, তদানীন্তন বৃটিশ সরকার এ ব্যাপারে লেখকের উপরে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন।

এই চাপের এক পরিচয় বঙ্কিমের সরকারি কর্মের তালিকা। ১৮৮০-৮২ খৃস্টাব্দের সারভিস রেকরড লক্ষণীয় ঃ ১৮৮০, ৬ নভেম্বর—হুগলীতে ডেপুটি ম্যাজিসট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর। ১৮৮১, ১৪ ফেবরুয়ারি—হাবড়ায় একই পদে। ১৮৮১, ৪ সেপটেমবর—কলকাতায় রাইটারসে বেঙ্গল গভরন-মেনটের অ্যাসিসটানট সেকরেটারি। ১৮৮২, ২৬ জানুয়ারি—আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিসট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর। ১৮৮২, ৪ মে—বারাসাত, একই পদে। ১৮৮২, ১৭ মে—আলিপুরে একই পদে। ১৮৮২, ৮ আগসট—জাজপুর, কটকে একই পদে।

লক্ষণীয় বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে আনন্দমঠ প্রকাশের সময়ে তাঁকে কলকাতা রাইটারস থেকে হঠাৎ বদলি করে দেওয়া হয়। দেড় বছরের মধ্যে ছয়বার বদলি করা হয়। এই বদলির মূলে আছে আনন্দমঠ প্রকাশ।

ঐ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র সরকারের কতদূর বিরাগভাজন হন ও বিপন্ন হন, তার অপর পরিচয় নিহিত আছে আনন্দমঠের পুরোভাগে মুদ্রিত নব-বিধানের সাপ্তাহিক ইংরেজি মুখপত্র 'দি লিবারেল'-এর রিভিউতে। এই রিভিউটিকে বলা যায় সারটিফিকেট। ব্রাহ্মদের সাপ্তাহিক পত্রে বঙ্কিমের আনন্দমঠ—যা পৌত্তলিক কল্পনায় ভরা—তার প্রশংসা মুদ্রিত হল কেন এবং কেনই বা বঙ্কিম তা আনন্দমঠের সংস্করণগুলিতে বারবার মুদ্রিত করেন ? —এই প্রশ্নের উত্তর আজ পর্যন্ত কোথাও পাইনি।

সম্প্রতি নববিধান পাবলিকেশনস কমিটির প্রাক্তন সেকরেটারি ও নববিধান ট্রাসটের সভাপতি অশীতিপর সতী-কুমার চট্টোপাধ্যায় এই প্রশ্নের উত্তর আমায় লিখিতভাবে জানিয়েছেন ঃ

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অনুজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিনডিকেটের সদস্য, বহু ভাষাবিদ, ঐতিহাসিক, আবগারি কমিশনের সদস্য কৃষ্ণবিহারী সেন (১৮৪৭-৯৫) এই ঘটনার অন্যতম প্রধান সাক্ষী। বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্রের জন্ম একই বছরে (১৮৩৮) ; তাঁরা প্রেসিডেনসি কলেজে আইন বিভাগে সহপাঠী ছিলেন। পরস্পরের গুণমুগ্ধ ছিলেন। কৃষ্ণবিহারী সেনের তৃতীয় পুত্র ও পঞ্চম সন্তান জ্যোতিপ্রকাশ সেনের কাছে সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই অকথিত কাহিনী শুনেছিলেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের জবানীতে তা এখানে পেশ করছি।

'জ্যোতিপ্রকাশবাবু ১৯৫৭ খৃস্টাব্দে ব্রাহ্ম প্রচারক বাগ্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের 'শান্তি কুটীরে' বসে আমায় এই ঘটনার বিবরণ দেন।

'সে সময় (১৮৮২ খৃঃ) বঙ্কিমবাবু আমাদের সেন পরিবারের কলুটোলা বাড়ির কাছে ভবানীচরণ দত্ত লেনে একটি গৃহে থাকতেন। তিনি প্রায়ই আমাদের বৈঠকখানা ঘরে আমার বাবার (কৃষ্ণবিহারী সেন) সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করতেন। আপনি তো জানেন আমার বাবা অ্যালবারট হল, লাইব্রেরি ও কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ঐ সময় একদিন অনেক রাত্রে বঙ্কিমবাবু আদুল গায়ে কোঁচা জড়িয়ে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এসে উপস্থিত। ব্যাপার কি ? এখন 'কমল কুটীরে' কেশবচন্দ্রের কাছে যেতে হবে। বঙ্গদর্শনে তাঁর যে নতুন উপন্যাস 'আনন্দমঠ' বেরচ্ছে তাতে বৃটিশ সরকার রাজদ্রোহের গন্ধ পেয়ে তাঁকে (বঙ্কিমবাবুকে) তলব করেছিলেন—ছোটলাট মিঃ রিভারস টমসনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। বঙ্কিমবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করলে ছোটলাট তাঁকে সরকারের অভিযোগ বিষয়টি জানিয়ে বলেন যে লেখাটি বন্ধ করতে হবে। অন্যথা তাঁর চাকুরি যাবে। বঙ্কিমবাবু ছোটলাটকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে এটা উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে লেখা, রাজদ্রোহমূলক রচনা নয়। অনেক কথা হওয়ার পরে ছোটলাট বঙ্কিমবাবুকে জানান, যদি মিঃ কেশবচন্দ্র সেন বঙ্কিমবাবুর বক্তব্যে ও explanation-এ সমর্থন জানিয়েছেন, এ সংবাদ বঙ্কিমবাবু তাঁকে (ছোটলাট) জানাতে পারেন এবং লিখিতভাবে সেটি দু-একদিনের মধ্যে কেশবচন্দ্রের Liberal পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারেন, তবে তিনি (বঙ্কিমবাবু) অব্যাহতি পাবেন। আমার বাবা (কৃষ্ণবিহারী সেন) সব শুনে তখনি বঙ্কিমবাবুকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে 'কমল কুটীরে' রওনা হন। সেখানে কেশবচন্দ্র তখন 'নববৃন্দাবন নাটক'-এর অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি সব কথা মন দিয়ে শুনে Liberal পত্রিকায় যা প্রকাশ করতে হবে তা লিখে দেন এবং ছোটভাইকে (কৃষ্ণ-বিহারীকে) পরদিন বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে ছোটলাট সাহেবের কাছে গিয়ে সাক্ষাতে সব বুঝিয়ে বলতে বলেন। সেই মত তাঁরা দুজনে ছোটলাটের কাছে যান ও সব বুঝিয়ে বলেন। তাতে ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হয়। পরদিন ২ জুলাই ১৮৮২ রবিবার Liberal পত্রিকায় আনন্দমঠ সম্পর্কে ঐ লেখাটি প্রকাশিত হয়, উপন্যাস গ্রন্থাকারে বেরলে তাতে মুদ্রিত হয়।' □

হিন্দুত্ব নয়, মানবতা

আবদুল জব্বার

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' তাঁর 'মাস্টারপিস' বলে কেউ কেউ জ্ঞান করেন, কেননা তাতে স্বদেশমুক্তির বীজমন্ত্র 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি আছে। এটি অবশ্য সঠিক সাহিত্য বিচার নয়। কেননা এতে আঞ্চলিকতাও রয়েছে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিটি মুসলমানরা নিতে পারেননি, এর কারণ কি তা মুসলমানরা যেমন ভাল করে বোঝাতে পারেননি স্বদেশপ্রেমে তথা ধর্মোন্মাদনায় হিন্দুরা বুঝে দেখতেও চাননি।

'বন্দেমাতরম' অর্থাৎ মাতাকে বন্দনা করি এবং এই মাতা দেশমাতা। সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম। সুজলা সুফলা দেশমাতাকে বন্দনা করায় চাইতে ধর্মজ্ঞানে মহানচিন্তা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বোধহয় আর কিছু ছিল না কিন্তু ইসলামে প্রতীকীকরণ, প্রতীকপূজা যে মহাপাপ, যা শেরক—যা প্রথম পাপ—মানুষ খুনের চাইতেও মারাত্মক—যার মাফ নেই। এর জন্য দোজখে বা নরকে অনন্তকোটি বছর পুড়তে হবে। ইসলামের একেশ্বরবাদের মূলমন্ত্র হল আল্লাহ ছাড়া হজরত মোহম্মদ বা মা-বাবা পার্থিব অপার্থিব কোনো কিছুকেই প্রণাম-প্রণতি জানানো যাবে না। জানালেই তা থেকে পৌত্তলিক ভাববাদের জন্ম হবে। সেজন্য মা-বাবা বা শ্রদ্ধেয় পীর-অলি-আউলিয়াদের সামনে হাঁটুমুড়ে উন্নত মস্তকে উবু হয়ে বসে তাঁদের দুই পায়ে হাত ছুঁইয়ে সেই হাতে চুমো খেতে হয়—এর নাম 'বোছা' দেওয়া। সেজন্য দেশমাতাকে বন্দনা করার ব্যাপারে মুসলমানদের আপত্তি।

যে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির দ্বারা আনন্দমঠে শাসক মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সেই ধ্বনি আবার মুসলমানরা গ্রহণ করেন কি করে ?

বলা হয় কতিপয় দুশ্চরিত্র শাসকের বিরুদ্ধে, সে মুসলমান বা খৃস্টান যেই হোক—যদি বঙ্কিমচন্দ্র বা শিবাজী, রাণা প্রতাপ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তবে তা কি অপরাধ ?

ইংরেজরা এসে ইকবালের স্বপ্নের দেশ 'সারা জ'াহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা' জয় করে নেবার পর মুসলমানরা হীনমন্যতায় ভুগছিলেন। কোন মতেই খৃস্টানদের সঙ্গে তাঁরা হাত মেলাতে চাননি। ইংরেজরা এসে দেখল হিন্দুরা তাদের দেশ হারিয়ে হীনমন্যতায় ভুগছে। তারাই সংখ্যায় বেশি। মুসলমানরা ইংরেজ-খৃস্টানদের শত্রু, অতএব হিন্দুদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দাও।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজ বাহাদুরের ডেপুটি ম্যাজিসট্রেট ছিলেন। তিনিই প্রথম বি এ পাশ ব্যক্তি। এবং তিনি 'আনন্দমঠ' রচনার কাল বেছে নেন বাংলা ১১৭৬ সনের দুর্ভিক্ষের সময়—যখন নাকি মানুষ মানুষের মাংস খেয়েছে!

সমালোচক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব একদা জানিয়েছিলেন, বেঙ্গল গেজেট পত্রিকায় লেখা হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র নাকি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মূল পাণ্ডুলিপিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধেই লিখেছিলেন, কিন্তু ডেপুটি ম্যাজিসট্রেটের চাকরি যাবার ভয়ে তিনি এই পাণ্ডুলিপি কেটেকুটে শাসক ইংরেজদের জায়গায় শাসক-মুসলমানদের নাম বসিয়ে দেন।

কিছু কিছু করদ রাজা বা নবাব, জমিদার কি টিকে ছিলেন? বেঙ্গল গেজেটের সংবাদ কি মিথ্যা? ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় মুসলমান শাসকরা কোথায়? তবে কল্যাণীর দুর্দশা এই দুর্ভিক্ষকে প্রকট করেছে। আর হানটার সাহেবের কথাও ঠিক, মুসলমান শাসকরা আত্মসুখে দিশেহারা ছিলেন। বাদশা শাহজাহান যখন তাঁর বেগমের কবর বানাতে বিশ্বের দামী দামী পাথর কিনে আনতে দেশকে দেউলিয়া করে ফেলেছেন তখন দেশে দুর্ভিক্ষ বেধে গিয়েছিল।

যাহোক, মুসলমান শাসকরা যেমন আত্মসুখে ছিলেন হানটার সাহেব মুসলিম রাজন্যভাতা দিয়ে তাঁদের বেকার অপদার্থ বানানোর জন্যে দুঃখ করেছেন তেমনি ইংরেজরাও এদেশের স্বত্ব নিংড়ে নিয়ে গিয়ে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী শহর-নগরগুলো রত্নময় করে তুলেছিল। দুই শাসককুলই অল্পবিস্তর সমান।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচুর স্তুতি আর নিন্দা লাভ হয়েছে 'আনন্দমঠ' লিখে—হিন্দু-শক্তির পুনরুত্থানের তত্ত্বে। ধ্বংস হয়ে পড়তে থাকা মুসলিম রাজশক্তিকে ধূলিসাৎ করবার মানসে (ফকির বিদ্রোহ থেকে সন্ন্যাস বিদ্রোহ) বিদ্রোহী হিন্দুরা মনের সাধ মিটিয়েছে; এতে বোঝা যায় হিন্দুশক্তির পুনর্জাগরণের কথা। কিন্তু বিদ্রোহী দলে নানাভাবে ভাঙন দেখা দিল। সনাতন হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আর তাদের দ্বারা হল না। বিদ্রোহী দলের নেতা সত্যানন্দের মনোভঙ্গের আর সীমা রইল না। সেখানে লোকশিক্ষক ইংরেজদের অনুকূলে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

হিন্দুত্বের আড়ম্বর বঙ্কিম সাহিত্যের মধ্যে যতই থাক তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কিন্তু হিন্দুত্ব নয়—মানবতা। জেবুন্নিসা সাহিত্যের চরিত্র ধরলে অসামান্য সৃষ্টি—তার মাথাই সব চাইতে খাড়া হয়ে আছে। জেবুন্নিসা, শৈবলিনী আর ভবানন্দ এই তিনটিই 'অসাধু' চরিত্র। কিন্তু বড় গৌরবময়। চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীকে যখন তিনি 'পাপীয়সী' বলেন হিন্দুরা রাগ করেননি তো! আনন্দমঠের ভবানন্দকে কল্যাণীর মুখ দিয়ে বলেছেন, 'দুরাচার পামর!'

বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে সাহিত্য সম্রাট সেখানে বোধহয় মুসলমানদের আপত্তি নেই, যেখানে জাতির নেতা ঋষি সেখানেই আপত্তি। নইলে পূর্ব-পাকিস্তানের কট্টর মুসলমানরা বঙ্কিম সাহিত্যকে যখন বিদায় দিয়েছে তখন একজন মুসলমান প্রকাশকই চট্টগ্রাম থেকে বঙ্কিম-রচনাবলী ছেপে দিলেন, আর তা হু হু করে বিক্রি হয়ে গেল।

স্বাধীনতালাভের পর জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করা হয় 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে তা কেমন করে হতে পারে এমন আপত্তি মুসলমানরা জানাতে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমনঅধিনায়ক' গানটিও গ্রহণ করা হয়।

কিন্তু স্বাধীন 'বাংলাদেশ'—অধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সে দেশের যে জাতীয়সঙ্গীত গ্রহণ করা হয়েছে তা অহিন্দু রচিত রবীন্দ্রনাথেরই দেশমাতৃকার বন্দনাগান—'ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে' ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশে লোকশিক্ষক ইংরেজদের অনুগ্রহলাভ করে হিন্দুরা ইংরেজি শিখে জজ ম্যাজিসট্রেট, ডিরেকটর, কমিশনার, ডাক্তার, বিজ্ঞানী,, সাহিত্যিক, কবি ইত্যাদি হয়েও গেলেন। মুসলমান আমলের হীনমন্যতা ছেড়ে তাঁরা শিক্ষিত হয়ে উঠলেন যখন তখন মুসলমানরা রাষ্ট্রহারা হয়ে হীনমন্যতায় ভুগছেন। ইংরেজ শাসনের একশো বছর পরেও তাঁরা অন্ধকারে তলোয়ার ঘুরোচ্ছেন 'আজো আমরা নবাব বাদশা আছি।' কেননা ইংরেজরা তখনো তাঁদের রাজন্য ভাতা দেয়। ইংরেজরা মৃদু মৃদু হাসত। কেন না তারা জানত এরা অকর্মণ্য হয়ে গেছেন।...

বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমন্ত্র 'বন্দেমাতরম' যদি পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করার শক্তি যোগায় বহুকালের নিপীড়িত বঞ্চিত হিন্দুচিত্তে, তবে তারও একটা মূল্য আছে, এটা মুসলমানদের স্বীকার করতেই হবে। যারা করেন না তারা তো দেশ কেটে বখরা করে নিয়ে চলেই গেছেন। এতকাল পরেও আমাদেরই হয়েছে মুশকিল! যে দেশ চষে খেতে এসেছি তাকে 'মা' বলে বন্দনা করব এমন কি হয়। এতে মুসলমানীত্বে যে বাধে! তাই 'বন্দেস্বাধীনতাম' বললেই বোধহয় ল্যাটা চুকে যেত।

বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপোষণ করতেন না। তার মধ্যে অসহিষ্ণুতা বা পরাধীনতার অন্তর্বেদনা যেমন ছিল তেমনি আবার মানবতার জন্য মমত্ববোধও ছিল অসামান্য।

আর সাহিত্যিক হিসাবে সত্যিই তিনি সম্রাট—আমরা পঞ্চাশজন সাহিত্যিকও এক পাল্লায় তাঁর সমকক্ষ বোধহয় নয়। তাঁর আনন্দমঠের সত্যানন্দের হৃদয়-জ্বালা শেকসপীয়রের সাইলকের মত—বাইরে থেকে ভব্যতায় ঢাকা, ভেতরে ভেতরে তুষের আগুন। তবুও আঞ্চলিকতা তাতে বিদ্যমান। তাই সর্বজনীন নয়। আনতন শেখভ অনেক উঁচুদের সৌখিন সাহিত্যিক কিন্তু লিও টলসটয় ততটা না হয়েও জীবনের বৃহৎ বেদনার ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতা ছাড়িয়ে সর্বজনীন মানবতাকে স্পর্শ করতে পেরেছেন বলে তাঁর স্থান পৃথিবীর সবার ঊর্ধ্বে।

হিমালয় পর্বতের শোভা অপরাসীম কিন্তু মাঝে মাঝে তার মধ্যে গভীর গিরিখাত আছে। চাঁদেও কলঙ্ক আছে। কলঙ্কশূন্য মানুষ হয় এমন তত্ত্ব বুদ্ধিজীবীরা মানেন না। ভবানন্দ সত্যানন্দ ভাল মন্দ দুই শক্তি বঙ্কিমে খেলা করেছে। মতও পালটেছেন তিনি বহুবার। প্রথম জীবনে তিনি নাস্তিকও ছিলেন। বেদের চাইতে গীতা শ্রেষ্ঠ তাঁর এই মত কজন হিন্দুই বা মানছেন। তাঁর হিন্দুত্বও দেশপ্রেম ছাড়া কিছু নয়। তাঁর ধর্ম তন্ময়তা জীবনবেদের রচয়িতা কেশব সেনের ধারেকাছেও পৌঁছয় না। ব্রাহ্মদের প্রভাবে তিনি তেত্রিশ কোটি দেবতাদের অপকৃষ্ট লৌকিক ধর্ম বলেছেন। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য চিন্তার অবগাহন করা মানুষ। তাই ভারতের রক্তে মাংসে মিশে যাওয়া একটি সম্প্রদায় সম্বন্ধে সতর্ক হলেই পারতেন, রবীন্দ্রনাথ যেমন সতর্ক ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও মুসলমানদের অভিযোগ তিনি মুসলমানদের জন্য কী করেছেন? রবীন্দ্রভক্ত কাজী আবদুল ওদুদ এর উত্তরে বলেছেন, আকাশের সূর্য মুসলমানদের জন্য কী করেছে?

কিন্তু মুসলমানরা হিন্দুদের জন্য কী করেছেন, সে প্রশ্ন তো আসতে পারে? ☐

শেকসপীয়র তা হলে ইহুদি বিদ্বেষী ?

কবিরুল ইসলাম

১

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বন্দে মাতরম-এ সুর সংযোজন করে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন। আনন্দমঠের বীজমন্ত্র বন্দেমাতরম। রবীন্দ্রনাথ এতদূর পর্যন্ত প্রাণিত ও প্রভাবিত হয়েছিলেন যে বন্দেমাতরমকে ধ্রুবপদ করে তিনি একটা গানও রচনা করেছিলেন ঃ

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন—
বন্দেমাতরম ।।···

এই গানের আরও দুটি স্তবক আছে। প্রত্যেকটি স্তবকের মন্ত্রধ্বনি বন্দে-মাতরম।

মারকুইস অব জেটল্যানড আনন্দ-মঠকে বলেছিলেন 'a parable of patriotism'.

বন্দেমাতরম সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের মত উদ্ধৃত করি ঃ Among the Rishis of the latter age we have at last realised that we must include the name of the man who gave us the reviving Mantra which is creating a new India, the Mantra 'Bande Mataram'

২

মুসলিম লীগের নেতারা আনন্দমঠ পুড়িয়েছিল। এর পেছনে ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। তৎসত্ত্বেও তা ছিল নিতান্তই বাড়াবাড়ি। সত্য যে, আনন্দমঠে মুসলমান বিদ্বেষ ছিল, মুসলমানদের প্রতি কটূক্তি ছিল ঃ কিন্তু এটা কিছু যথেষ্ট কারণ ছিল না। দেখা গেছে, মুসলমানেরা বরাবরই একটু বেশি রকম স্পর্শকাতর। প্রায় বিনা কারণে কিংবা অল্প কারণে বারে বারেই তার প্রকাশ ঘটেছে। আনন্দমঠে যৎসামান্য ইন্ধন ছিল ; তাই বিনা কারণে বলব না, অল্প মেঘেই বজ্রাঘাতেরও বেশি ভুল বোঝাবুঝি হল। কোন শুভবুদ্ধি ও নিরপেক্ষ পাঠক এভাবে ভাবতে পারত না। ঐ দুঃসময়ে মাথা ঠিক রেখে রেজাউল করীম যা ভেবেছিলেন, সম্ভবত তাই ঠিক। 'আনন্দমঠে স্বদেশ-প্রীতির যে করুণ আবেদন রহিয়াছে, তাহা প্রত্যেক পাঠকের মর্মস্থল স্পর্শ করিবে। মুসলিম-বিদ্বেষ তাহার নিকট বড় বলিয়া মনে হইবে না।' তিনি তাঁর এই ভাবনা-চিন্তার ফলস্বরূপ বড় মাপের একখানা ছোট বই লিখেছিলেন ঃ 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ'। স্যার যদুনাথ এই বই-এর ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন ঃ 'এই মূল্যবান গ্রন্থ বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হউক, ইংরাজী সংক্ষিপ্ত অনু-বাদ ভারতময় পঠিত হউক। তবেই সত্যের জয় হইবে।'

বস্তুত, আনন্দমঠে মুসলমান-বিদ্বেষ, মুসলমানদের পক্ষে অপমানকর উক্তি বড় নয়, লক্ষ তো নয়ই। লক্ষ ছিল ঃ দেশ প্রেম। আনন্দমঠের প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ স্বদেশের স্বাধীনতা।

৩

বঙ্কিমচন্দ্র মুসমলমান বিদ্বেষী ছিলেন না। তাঁরই অঙ্কিত আয়েষা, দলনী ও জেব-উন্নিসা-মবারক চরিত্র-বলি। মীরকাশিমও তিনিই এঁকে-ছেন। মুসলমান কৃষকের কথা তিনিই লিখেছিলেন। রাজসিংহ উপন্যাসের উসংহারে 'গ্রন্থকারের নিবেদনে' বঙ্কিমচন্দ্রই লিখেছেন ঃ 'গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে।···অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক—সেই নিকৃষ্ট।'

৪

তবু এ দেশের মুসলমান-সম্প্রদায় বঙ্কিমচন্দ্রকে ক্ষমা করতে পারেনি। অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র সহানুভূতির সঙ্গে তাদের কথা ভেবেছেন। তিনি মনেপ্রাণে জানতেন হিন্দু-মুসলমানের যৌথ উন্নতি ভিন্ন বঙ্গদেশের উন্নতি অসম্ভব, সুদূরপরাহত। তিনি লিখেছেন ঃ 'বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে পৃথক—পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে, তাঁহারা ভিন্ন দেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখবেন না, বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু-ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।'

বন্দেমাতরম মহাসঙ্গীতেও বঙ্কিম-চন্দ্র 'সপ্তকোটী কণ্ঠে'র কথাই বলে-ছেন অর্থাৎ আনন্দমঠের আহ্বান হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে প্রতিটি বাঙালির জন্যে। আনন্দমঠ স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত করে, জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে।

৫

আনন্দমঠের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন ঃ 'উপন্যাস উপন্যাসই, ইতিহাস নহে।' বিভিন্ন সংস্করণে আনন্দমঠের সংশোধন-পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্যের তাৎপর্য বোঝা যায়।

পরিশেষে প্রশ্ন ঃ কোন উপন্যাসের অন্তর্গত এক বা একাধিক চরিত্র-উচ্চারিত সংলাপ-সমূহের দায় কি ঔপন্যাসিকের ওপর বর্তায়? আনন্দমঠের ভবানন্দ, জীবানন্দ, বা সত্যানন্দের মুসলমান-বিদ্বেষ বা মুসলমানদের পক্ষে অপমান-জনক উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের উপর আরোপ করা কি উচিত হবে? তাহলে তো মহাকবি শেকসপীয়রকে ঘোর ইহুদি-বিদ্বেষী বলতে হয় !! □

এ মুহূর্তে আনন্দমঠ নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর

প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-কে নিয়ে যে বিতর্কের অবসান হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে নতুন করে তাকে টেনে এনে অপ্রয়োজনীয় অসঙ্গত বিতর্কে নামিয়ে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান তাত্ত্বিক ও সমাজচিন্তার পরিচয় দিলেও সামগ্রিকভাবে ঠিক কাজ করেননি।

ইতিহাস ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আলোচ্য বিষয়, জানার বিষয়। আর সাহিত্য হল আস্বাদনের বস্তু। কোন সাহিত্যই সমালোচনার বাইরে নয় বলে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'ও সমা-লোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। নিশ্চয়ই সমালোচনা করতে হবে এর চরিত্রগুলি সার্থক কিনা। কাহিনীর গতিবেগ, অলৌকিকত্ব, ধর্মজ্ঞান প্রভৃতি যথার্থ কিনা। সাহিত্যের এই বিচারে আনন্দমঠ কৌলীন্য না পেতেও পারে। কিন্তু এর বিষয়বস্তু এবং পটভূমি অথবা তৎকালীন হিন্দু-মুসলমানের মানসিকতা ও সমাজচিত্র প্রসঙ্গে যদি সত্য কোথাও অবশিষ্ট থাকে এবং তাকে অবলম্বন করে যদি সেই গণতন্ত্রহীন, সমাজতন্ত্রহীন, আধুনিক বন্দোবস্তহীন সামন্ততান্ত্রিক বাংলার নিরক্ষর গ্রাম ও জনপদের কিছু রক্ষণশীল অথচ উদ্দীপ্ত, নিপীড়িত মানুষের মুখ দিয়ে লেখক কিছু অপ্রিয় সত্যের অমার্জিত উক্তি করেও থাকেন তাহলে তাকে আক্রমণ করার কি আছে?

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮২ সালে যা প্রকাশ করলেন তা যদি সমসাময়িক বিষয়বস্তু নিয়ে হত তাহলে নিশ্চয়ই এই ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন সেখানে না দেখলে আমরা দুঃখিত হতাম। কিন্তু তিনি তার একশ বছর আগের ইতিহাসকে ফেলে এসেছিলেন। ফলে তিনিই বা সত্যের অপলাপ করেন কি করে আর আমরাই বা খুশি হই কি করে?

উগ্র সমালোচকদের কেউ কেউ অবশ্যই 'আনন্দমঠ' পরবর্তী সংস্করণের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে রাজশক্তির চাপ প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করে থাকেন। ব্যাপারটা যদি নিছক প্রগতিশীল সাজার প্রতিযোগিতা হয় এবং ভোটের ব্যাপার হয় তাহলে বলার কিছু নেই—কিন্তু যদি ইতিহাসের দর্পণে যাচাই করতে হয় তাহলে দেখব যে আনন্দ-মঠের অনেক পরে 'দেবী চৌধুরাণী' প্রকাশ করে বঙ্কিমচন্দ্র ভবানী পাঠকদের দিয়ে ইংরেজ বিরোধী মনোভাবের আগুন জ্বেলেছেন। তাহলে সেসময় কি তার ইনক্রিমেনট বন্ধ হয়েছিল এবং আনন্দমঠের আগেই কমলাকান্তের দপ্তরের প্রবন্ধগুলো হচ্ছিল। সেগুলো কি সাম্প্রদায়িক?

মুসলিমদের একাংশের কাছে বিতর্কিত চরিত্র শিবাজীকে নিয়ে কবিগুরুর 'শিবাজী উৎসব' যে সময়ের রচনা তখন কি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্ম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উদারনৈতিক মন ও মতামত জানতে দেশবাসীর বাকি ছিল? তবুও কি 'শিবাজী' উৎসব লিখে গুরু রামদাসের বন্দনা গান গেয়ে

কবিগুরু সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট হয়েছিলেন ?

'বন্দেমাতরম' তো আনন্দমঠের অনেক আগের রচনা। একে শুধু মা না বলে দেশ বলা এবং তার ব্যাখ্যায় 'মা যা ছিলেন এবং মা যা হইয়াছেন' এই ব্যাখ্যায় জরাজীর্ণ কঙ্কালময় দেশের চিত্রকে তুলে ধরার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল, না সঠিক চিত্র রূপায়ণের উদ্দীপনা ছিল ? একাধিক সভা-সমিতিতে যুবকদের অনুপ্রাণিত করতে সুভাষচন্দ্র বসু আনন্দমঠের এই অংশটি ব্যবহার করেছেন। সেকি শুধু হিন্দু ছেলেদের উদ্দেশ্যে না হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই উদ্দেশ্যে ?

নেপাল মজুমদারের 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' বইতে আছে 'এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বাংলাদেশে তখন স্বাদেশিকতাবোধকে জাগরিত করিবার জন্য, কালীপূজা, দুর্গাপূজা বা শক্তিপূজার ঢেউ আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া বাংলার রুদ্রপন্থী সন্ন্যাসবাদীদের মধ্যে কালীপূজা ও শক্তিপূজার প্রাবল্য লক্ষণীয়। সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণীর' প্রভাব স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কালীপূজা এবং মহারাষ্ট্রের 'বীরপূজা' 'শিবাজী উৎসব' ও ভবানীপূজার প্রভাব,—সে যুগে এইসব কিছু মিলিয়া আমাদের (বিশেষত বাংলাদেশের) স্বাধীনতা আন্দোলনের নৈতিক শক্তির প্রেরণা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগাইয়াছে'।....(পৃঃ ১৮, ১৯)

এই নৈতিকশক্তির প্রেরণায় 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি আর আনন্দমঠের সন্তানদলের উদ্দীপনা আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কাজ করেছিল কিনা এটাই বিচার্য বিষয়। ১৯১৭-র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাস বললেন—'Bankim came and set up the image of our mother in the motherland. He set up the image, and inspired it with life, and it was he who beheld and recognised the mother first. He called upto the whole people and said, 'Behold, this is our mother ; worship her and establish her in your houses.' The song which he sang was of this mother, 'Well-watered, well fruited, cool with the South breeze, green with the growing corn.' But we were deaf to the song that he sang, we were blind to the image that he saw, and hence Bankim lamented and said : 'I am crying alone in the wilderness.'...(Page – 30)

বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য যাই থাক তিনি যে তখনকার পটভূমিকে কেন্দ্র করে কোন দাঙ্গা বাধাতে চেয়েছিলেন এ কথা তো আর 'আনন্দমঠ' সাক্ষ্য দেয় না। আনন্দমঠের সন্তানেরা তাই জয়-পরাজয়ের যে কটি লড়াই করেছে নবাবী সৈন্য ও ইংরেজ সৈন্য উভয়েরই বিরুদ্ধে।

সেই নবাবী সৈন্যের দলে হিন্দুস্থানী ও তেলেঙ্গানীরাও ছিল এবং তারা মার খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল সে বর্ণনা উজ্জ্বল করে তুলে ধরা হয়েছে। অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল একটি সঞ্জীবনী শক্তি বা মন্ত্রের মাধ্যমে দেশমাতৃকার পাশে সবাইকে সংঘবদ্ধ করা। দেশকেই মা বলতে গিয়ে যদি বন্দেমাতরম রব বর্ণনা থেকে থাকে তাতে সাম্প্রদায়িকতা এল কোথা থেকে ?

এ কথা সত্য যে মুসলমান শাসনের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘৃণা বা প্রতিবাদের যে ভাষা আনন্দমঠে ব্যবহৃত হয়েছে তা মার্জিত নয় এবং সেখানে কোন লালিত্য ছিল না। কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসীদের মুখ দিয়ে তাঁদের গোঁড়ামির জন্যই হোক বা তাঁদের উদ্ধার জন্যই হোক সে কথা আনন্দমঠে ব্যবহৃত হয়েছে তার সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্রকে Protection দেবার জন্য কোন যুক্তির অবতারণা করছি না। শুধু বলছি—সত্যের প্রয়োজনে সন্ন্যাসীর মুখ দিয়ে তখন ঐ কথাটুকু বের হওয়াই যথেষ্ট স্বাভাবিক এবং বাস্তব। লক্ষ্মণ সেনের পরাজয় যখন হল তখন বক্তিয়ার খলজির সিপাহীরা কী ভাষায় উল্লাস করেছিল অথবা পরাজিত লক্ষ্মণ সেনের লোকেরা বক্তিয়ারদের প্রসঙ্গে কী মন্তব্য প্রকাশ করেছিল তাই নিয়ে সেকালের মুখের ভাষায় হুবহু বসিয়ে যদি কেউ কোন কাহিনী প্রকাশ করতেন তাকে কি আমরা সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট করে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতাম ? আনন্দমঠ যে পটভূমি নিয়ে বারবার আলোচনার সূত্রপাত করছি সেটাই কিন্তু মূল কথা। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য মূলত দায় কার ? কেউ বলছেন কোম্পানির লোক, কেউ বলছেন নবাবের দলবল। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত 'প্রাক-পলাশী বাংলা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, তখনকার সমসাময়িক ইংরাজ লেখকদের মধ্যে অনেকেই অনেকরকম অভিযোগ-নামা মুরশিদকুলি খাঁ থেকে সিরাজ-দৌল্লার বিরুদ্ধে পর্যন্ত দায়ের করেছিলেন যার ভিতর থেকে সমগ্র মুসলমান শাসন ও সামগ্রিক হিন্দু জনগণের অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল।

মারাঠা বর্গীরা যখন এ রাজ্যে অবাধ লুণ্ঠন ও হত্যা করতে এসেছিল তখন কিন্তু মুসলমান শাসকদের পিছনে দাঁড়িয়ে হিন্দুরা বিপন্ন মুসলিম শাসকদের বাঁচাতে ও বর্গীদের এদেশ থেকে তাড়াতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল। সুবোধবাবুর বয়ান অনুযায়ী গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণে নাকি এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঘটনা যা নিয়ে ইতিহাসে এখন যথেষ্ট বিতর্ক আছে এবং যাকে আনন্দমঠের পটভূমির উপজীব্য বিষয় বলে ধরে নেওয়া হয় সে ঘটনাও কিন্তু এরই সমসাময়িক। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এবং ফকির বিদ্রোহ যা হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলমান ফকিরদের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল তাকে ডাকাতিই বলা হক আর লুঠই বলা হক তা যে শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এর প্রমাণ ইতিহাসে আছে।

১৯৫৬ সালের ১২ নভেম্বর সান ইয়াৎ সেনের স্মরণ সভায় মাও-সে-তুঙ বলেছিলেন 'পুরোভাগে থেকে ঘটনা-বলীর অগ্রগতিকে যাঁরা চালনা করেছেন, ইতিহাসের সেইসব মহান পুরুষের মত ডঃ সানেরও কিছু ত্রুটি ছিল। এই ত্রুটিগুলিকে ঐতিহাসিক অবস্থার আলোকে ব্যাখ্যা করা উচিত যাতে জনগণ বুঝতে পারে। পূর্ব-সূরীদের অতিরিক্ত সমালোচনা করা আমাদের উচিত নয়।' (মাও-সে-তুঙ রচনাবলী ৫ম খণ্ড পৃঃ ২৯১)

বামফ্রন্টসহ কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা দেশে যদি বৃহত্তর বৈপ্লবিক পরিবেশ সৃষ্টি করে সত্যিকারের ভেদা-ভেদহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চান তবুও তাদের বলব যে, সামান্য একটা রাজ্যসরকারের নির্ধারিত মেয়াদের গণতন্ত্রের বাক্যপোষ গায়ে দেওয়া ক্ষমতা নিয়ে এত দ্রুত এত তাড়াহুড়ো করতে গেলে সেটা কি তাদের পদক্ষেপের দিক থেকেও ঠিক হবে ? □

ক্ষুদিরাম দাস

আনন্দমঠে নিরানন্দ !

মঠে হত্যালীলা ? কল্পিত ঘটনা ১৭৭০—৭৫ খ্রীঃ। তস্য কল্পিত বিবরণী। পরিবেশনায় সাহিত্য-সম্রাট। কালসীমা শতাধিক বৎসরান্ত। তা নিয়ে প্রহসন জমিল সম্প্রতি, অর্থাৎ আরও শতাব্দী পরে। প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণে শীতার্ত নির্লেপানন্দ ঃ

মুখ্য ভূমিকায় আসরে দাঁড়াইয়া-ছিলেন শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ সম্রাটের তালুকের প্রজা অক্কাদামী। কনসারটে ছিলেন বাছা বাছা সংবাদপাঠিক এবং আরও কেহ কেহ। কেহ ঢোল, কেহ কাঁসি, কেহ বা শুধু পোঁ ধরিয়াছিলেন। প্রহসন জমিয়াছিল ভাল এবং আরও জমিত, কিন্তু—'সহসা ঝনাক্ ঝান্, তানপুরে কাটে তান'। জয়জয়ন্তী রাগিণীতে কড়ি-মধ্যম বাজিয়া উঠায় সাধের আয়োজন বেসুরো হইয়া গেল। হায়, হায় ! পক্ষে থাকিয়াও কি প্রতি-পক্ষের আচরণ করিতে হয় ? যুক্তি-বিবেক কি এতই বড়, এতটাই বরণীয় যে তার ধাক্কায় সাধের সেনটিমেনটের পাকা ব্যবস্থা হটিয়া যাইবে ? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থকও সুটিল বিস্তর। স্থানীয় ঢাকী ঢুলী হইতে দিললির সারেঙ্গী পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যানিধিরাও উঁকি দিয়া দেখিতে লাগিলেন। বেরসিক সরকার থামাও থামাও বলিয়া যদিচ রণে ভঙ্গ দিলেন, সাধের প্রহসন পণ্ড হইল না। হাট আশ্রয় নিল বাজারে। ভবীকে থামায় কার সাধ্য। কোন্দলের গোড়া খুঁজিয়া পাইলে তাহা ত্যাগ করার নজীর জাতীয় চরিত্রে আছে না কি ? তার উপর অক্কাদামীর কী ক্ষতিটাই না হইল, বলুন তো ? মারো কাটো পোড়াওটাকে আতর-চন্দনে প্রায় শুদ্ধ করিয়া তোলা হইয়াছিল, হয়ত বা মানত করিয়া তবেই সম্রাট-পূজার উদ্‌যোগ করা হইয়াছিল। জ্যান্ত রুই মাছটা লুকাইবার জন্য শাকও জমা করা হইয়াছিল বিস্তর—মু কৌশড় করিব, মু বঙ্গদর্শন-অখুলিকিরি দেখাইব, প্রথম সংস্করড় -অ ছপাইব—ইত্যাদি। এদিকে ঢাক-ঢোল-কন্ধীরা কোমর বাঁধিয়া বাছা বাছা পক্ষীয় মত সংগ্রহে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। অ্যামবাসাডারে রাস্তার জ্যাম বাড়িয়া উঠিল। চিঠিপত্রে রিপোরটে বিবরণে অফিসে বারান্দায় পা ফেলা দায় হইয়া উঠিল। শীত-ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িল, লেখককুল নিদাঘের ঘামে কাগজপত্র ভিজাইয়া তুলিলেন। কী ? এত বড় কথা ? আনন্দমঠ জাতীয় সংহতির বিরোধী ? বঙ্কিম বাঁকা আচরণ করিয়াছেন ? তাহা হইলে উহাকে দৃঢ় হস্তে উত্তোলিত করিয়া

আমাদের জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যেরা যে ইংরেজের নাক কাটিয়া দিয়াছিলেন তাহা কি অসত্য ? প্রতিপক্ষ শুধু ক্ষীণকণ্ঠে নিবেদন করিলেন—কেবল মুসলমান নিধনই নয়, উহা যে ইংরেজ স্তোত্রেও ভরা, হুজুর !

প্রহসনের দ্বিতীয় দৃশ্যে তরজার লড়াই আরম্ভ হইল। ঢাক ঢোল কাঁসি উচ্চরোলে চাপান ধরিলেন—-

বাজে কথা, মিথ্যা নিন্দা। ঋষির এ
চাতুরি।
জ্যাঠারা ঠিক ধরেছিলেন, আমরা বুঝতে
নারি ।।

অকাদামী জবরদস্ত গবেষণা সমিতি। সহজে ছাড়িবার পাত্র নন। অম্বুদ-নিনাদে গাহিলেন—

দেখাও দেখি কোথা আছে ইংরেজ-নাম
গান।
দেখিয়ে দাও কোথা আছে মারো
মুসলমান ।।
থাকলে পরে অর্থটা তার অন্যরকম
হবে।
(আর) সম্রাটে ভুল থাকেই যদি,
গবেষণায় যাবে ।।
আনন্দমঠ উপন্যাসে সাংকেতিকো হএ।
ইংরেজ ঔর মুসলমান বদল কর
লিজিয়ে ।।
(না হয়) মারা অর্থে কোলাকুলি—
'শব্দাম্বুদি' দেখো।
পোড়াও অর্থে চুমু খাও অদ্য হইতে
শেখো ।।

ঢাক ঢোল সারেঙ্গী একসঙ্গে তুমুল সমর্থন জানাইলেন—

বহুৎআচ্ছা, নদীহট্টের শাস্ত্রী বামী পাচী।
কলকাত্তিয়া খেমটাওয়ালী আমরা
আনাইতাছি ।।

এবার উতোরের পালা। উতোর দলের তেমন সরঞ্জাম নাই, আছে শুধু একটা ভাঙা কাঁসি। আর বক্তব্য ছন্দে গাঁথতে নারাজ, জবাব দেয়, কাটা কাটা গদ্যে—

'সে কি মহামান্যেরা, দিনকে রাত করিতে চাহিতেছেন ? ভাবিয়া দেখুন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় কত খৃস্টাব্দ হয় ? যদি ১৭৬৯-৭০ হয়। তখন মীরজাফর তো এন্তেকাল করিয়া বেহেস্তে গিয়া গদী দখল করিয়াছেন। এই রঙ্গের বঙ্গে তেনার প্রচারিত পুত্র নাবালক নজমুদ্দৌলাই তো নামে নবাব। দ্বৈত শাসনে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা কাহাদের হস্তে ছিল তাহা তো আপনাদের মত সর্বজ্ঞের নিকট বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। মুসলমান-শক্তির তো তখন নাভিশ্বাস উঠিতেছে। আবার ১৭৭২ খৃঃ বঙ্কিমের প্রশংসিত ওয়ারেন হেসটিংস কোমপানির গভরনর জেনারেল পদে স্থাপিত হওয়ার পর সেই মৃত্যুপথযাত্রী মোগলশাসনের ক্ষীণ নাড়ীতে আর কোন বেগ কি ছিল ? তাহা হইলে মুসলমানের রাজত্ব লইয়া সাহিত্য-সম্রাটের এতটা উদ্বেগের প্রয়োজন ছিল কী ? মৃতের দেহে খড়্গাঘাত কি উচিত হইয়াছে ? আবার দেখুন, হেসটিংস প্রেরিত গোরা ক্যাপ-টেন পরিচালিত গোরা সিপাহী ও কিছু মুসলমান সিপাহীর সঙ্গে সন্তানদের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। আসলে যুদ্ধটা হইতেছে ইংরেজদের সঙ্গে, পোড়ানো হইতেছে মুসলমানদের গ্রাম। পরিশেষে—ইংরেজ আসুক, ইংরেজ-শাসন দীর্ঘজীবী হোক—এই মহাবাক্যেই তো আনন্দমঠের সমাপ্তি। আপনাদের প্রশ্ন করি, এরূপ পরস্পর বিরোধী ইতিবৃত্তের গ্রন্থন তো সাহিত্য-সম্রাটের আর কোনো উপন্যাসেই নাই। মহোদয়েরা যদি বলেন—আমাদের জ্যেষ্ঠতাতেরা আনন্দমঠ মাথায় করিয়া স্বদেশী আন্দোলন প্রারব্ধ ও সার্থক করিয়াছিলেন, তাহাতে তো ভুল নাই—তদুত্তরে জানাই, তাঁহারা 'বন্দেমাতরম' নামক আশ্চর্য মন্ত্রগীতটি আশ্রয় করিয়া-ছিলেন, গোটা আনন্দমঠ নহে। তবে সংহতি ও সংগ্রামের একটা আভাস উহা হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন। এমনকি তাঁহারা 'আনন্দমঠে'র প্রথম-সংস্করণের ভূমিকায় লিখিত সাহিত্য সম্রাটের নিবেদনটিও হয় পড়েন নাই, নয় অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। নিবেদনে আছে—

সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাঙ্গালাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

১৯০৫-৬-এ যাঁহারা বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানাইয়াছিলেন, তাঁহারা পুনঃপুনঃ নমস্য, কিন্তু তাঁহারা তখন কেবল বন্দেমাতরম মন্ত্রেই অভিভূত হইয়া-ছিলেন। বিপ্লবের প্রারম্ভে যুক্তিবিচার তেমন কার্যকর হয় না, যতটা হয় সেনটিমেনটের উদ্বোধন। সেদিক হইতে তাঁহারা প্রায় পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। যদি গোটা আনন্দমঠ তাঁহাদের অবলম্বন হইত আনন্দমঠ লইয়া অভিনয়ের আয়োজন হইত না কি ? নিশ্চয় তীব্র মুসলিম-বিদ্বেষই উহার স্বাদেশিক প্রচারে বাধা জন্মাইয়াছিল। অবশ্য বঙ্গভঙ্গসহ স্বাধীনতার আন্দোলনকে হিন্দুর আন্দোলনই বলিতে হইবে। কারণ, নানা কারণে মুসলিম সমাজ আধুনিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত ছিল। তখনকার জাতীয়তাবাদ মানে ধর্মপ্রেরণাযুক্ত হিন্দু মতবাদ। কিন্তু এই আন্দোলনে মুসলিমদের সপক্ষতা না থাকায় বিষয়টি মনীষীদের নতুন করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইয়াছিল। ১৯০৭-৮ খৃস্টাব্দেই ভুলটা ধরা পড়িয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ

277 F-242 BEN

তাহা ভাষণে লিখনে জানাইয়াছিলেন। বিশেষে বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোধা শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার 'দেশ ও জাতীয়তা' নামক প্রবন্ধে ঐ সময়ে অনুতাপসহ কী অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন দেখুন—

'আমাদের রাজনীতিবিদগণ প্রায়ই মায়ের সম্পূর্ণ স্বরূপ দর্শন করিতে অসমর্থ ছিলেন।.....মাতৃদর্শনের অভাবে সেই অন্তরায় নাশের বলবতী ইচ্ছা নাই বলিয়া উপায় উদ্ভাবিত হয় না, বিরোধ তীব্র হইতে চলিয়াছে। কিন্তু অখণ্ড-স্বরূপ চাই, যদি হিন্দুর মাতা, হিন্দু জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা বলিয়া মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, সেই পুরাতন ভ্রমে পতিত হইয়া জাতীয়তার পূর্ণবিকাশে বঞ্চিত হইব।'

অর্থাৎ ভুল হইয়াছে। তাহা হইলে দেখুন, মহামান্য অক্লান্তামীর গবেষকবৃন্দ, সাহিত্য-সম্রাট যে কোন কারণেই হোক না কেন, মুসলমান সমাজের উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন। উপন্যাসে আয়েষা, ওসমান, মবারক, চাঁদশাহ ফকির প্রভৃতির মহৎ চরিত্র অঙ্কন করিয়াও আনন্দমঠে বিপরীত ভাব দেখাইয়াছেন। কে জানে, তুর্কী আক্রমণ হইতেই আমাদের পরাধীনতা—এই দৃঢ় ধারণাই তাঁহাকে ক্রমল ঐরূপ মুসলিম-বিদ্বেষী করিয়াছিল কিনা। সে যাই হোক মুনিদেরও তো মতিভ্রম হয়। মহাকবিও তো বিপ্লব-বিরোধী চার-অধ্যায় লিখিয়াছিলেন। ইহার জন্য সাহিত্যিকদের সমর্থনে কোমর বাঁধিয়া লাগিতেই বা যাইব কেন, আর ভুলগুলোকে সংশোধন করিতে বসিয়া উল্টা ভুলের বহরই বা বাড়াইয়া তুলিব কোন প্রয়োজনে? ভুলের মধ্য দিয়াই তো দেশকে অগ্রগতির পথ খুঁজিয়া লইতে হইবে। জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে বর্তমানে আমাদের কি ঐ গ্রন্থ লইয়া এত মাতামাতি সাজে?

উত্তোর-পক্ষের গদ্যে এইরূপ ফোড়ন-কাটা চাপান-পক্ষের সহ্যের অতীত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা তেলে-বেগুনে জলিয়া উঠিলেন, পুরাতন রীতিতে ভৈরবকণ্ঠে চিতেন ধরিলেন। ঢোল কাঁসি প্রাণপণে নিনাদিত হইতে থাকিল—

কি সাজে আর কি সাজে না আমরা বুঝি ভাল।
দেশের কথা উল্টো করে তোমরাই আগুন জ্বাল॥
বিদেশেতে মগজ বাঁধা তাদের সুরেই গাও।
ইতিহাসে বিদেশ গেঁথে দেশের মাথা খাও॥
বিদেশীদের ভাষা শিখলে শিশুর স্বাস্থ্য বাড়ে।
(তাদের) ইতিহাসের ছেঁদো কথায় সদ্য নাড়ী ছাড়ে॥
ঋষির হাতের হিন্দু-মোয়া মন্দ বলে কেবা।
কর্ণে তত্র পিধাতব্যো তোবা তোবা তোবা॥
বর্ষে বর্ষে শতবার্ষিক সরকারি কল্যাণ।
পিতৃব্যেরা হবেন সুখী পাইলে পিণ্ডদান॥

অতঃপর বিবাদীপন্থীরা কাৎ হইয়া গেলেন। তাঁহাদের আর কিছু বলিবার রহিল না। সানাইসহ ঢুলীরা বিজয়বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে 'প্রয়োজনে আবার লড়িব' শাসাইয়া গেলেন। অধিকারী ভরত-বাক্য পাঠ করিলেন—

মঠের আনন্দ-বার্তা যেইজন শুনে।
নিরানন্দ কভু না হয়, তাগদ দিনে দিনে॥
সরস্বতী বসুমতী যুগে যুগে জিও।
জাতীয়-চরিত্র-সুধা বর্ষে বর্ষে পিও॥ □

'আনন্দমঠ' এবং 'বন্দেমাতরম' নিয়ে সম্প্রতি যে বিতর্ক শুরু হয়েছে সে সম্পর্কে মতামত যাচাই করার জন্য কিছু দিন আগে কলকাতার একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও বুদ্ধিজীবীর কাছে হাজির হয়েছিলাম। এ ডবলু মাহমুদ। অক্সফোরড ফেরৎ ইতিহাসের ডিগরি-ধারী মাহমুদ সাহেব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ একসিকিউটিভ হিসাবে এবং পরবর্তী কালে রাজ্যের পাবলিক সারভিস কমিশনের সদস্যরূপে বহুদিন চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। অবসর গ্রহণের পরেও তিনি শিক্ষা জগতের নানা কাজে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগে একটানা বহু বছর অধ্যাপনা করেছেন। পঞ্চাশের দশকে এই কলেজে সে সময় যাঁরা ছাত্র ছিলেন তাঁরা আজও এই সুপরিচিত অধ্যাপকের কথা সকৃতজ্ঞ মনে স্মরণ করে থাকেন।

অধ্যাপক মাহমুদের সঙ্গে বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে আমি প্রায় তিন ঘণ্টা সময় আলোচনা করেছি। কখনও প্রশ্নোত্তরের ছকে আমার জিজ্ঞাসার সদুত্তর খুঁজেছি আবার কখনও বা তিনি সাধারণভাবে আলোচনা করেছেন আর আমি শুনে

সাক্ষাৎকার

সরোজবাবুর মানসিকতা সে যুগে থাকলে বঙ্গদেশ ভাগ হত নাঃ এ ডবলু মাহমুদ

গিয়েছি। আলোচনার শুরুতেই একটি কথা তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, তা হল এই যে, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি যে সব মন্তব্য করছেন সেগুলি একান্ত ভাবেই তাঁর নিজস্ব অভিমত। কথাগুলি তিনি যে ভাবে জোর দিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন তাতে আমার মনে হয়েছে যে আজকের এই লেখার প্রারম্ভেই এটি বলে নেওয়া প্রয়োজন। তাই এই উল্লেখ।

অধ্যাপক মাহমুদ বললেন, বঙ্কিমচন্দ্র একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক, তাঁর রচনার প্রসাদগুণ আজও তাঁকে মুগ্ধ করে। হালফিলের একজন নামকরা লেখক উপন্যাস হিসাবে আনন্দমঠের যে মূল্যায়ন করেছেন তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নমত প্রকাশ করে তিনি জানালেন যে উপন্যাস হিসাবে এই বইটির উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ। এ এমনই একখানা বই যা বঙ্কিমের মৃত্যুর এক যুগ পর থেকেই এ দেশের ইংরাজ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ সব কিছুই ইতিহাসের সত্য এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আনন্দমঠকে কিছুতেই খাটো করে দেখা চলে না। 'বন্দেমাতরম' সম্পর্কেও অধ্যাপক মাহমুদ উচ্ছ্বসিত। প্রসঙ্গত আমি তাঁকে মুজফ্‌ফর আহমেদ-এর মন্তব্যটি স্মরণ করিয়ে দিলাম—সেই যেখানে তিনি লিখেছিলেন যে 'একেশ্বরবাদী কোন মুসলিম ছেলের' পক্ষে বন্দেমাতরম মন্ত্র উচ্চারণ করা সুখপ্রদ না-ও হতে পারে (দ্রঃ আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিসট পারটি মুজফ্‌ফর আহমদ, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃঃ ১৪)। প্রত্যুত্তরে তিনি জানালেন আহমদ সাহেবের মন্তব্য খুবই ঠিক। ধর্মপ্রাণ কোন মুসলমান কিংবা কোন ব্রাহ্ম এই গানটায় আপত্তি তুলতে পারে এবং অতীতে তুলেছেও। তিনি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে দেশকে 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী' হিসাবে বন্দনা করার মধ্যে আপত্তিকর কিছুই খুঁজে পান না। অত্যন্ত আবেগভরা গলায় তিনি জানালেন, আমি মনে করি না প্রাচীন গ্রীসের সভ্যতা ইসলামের সভ্যতা থেকে কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল। তাই পৌত্তলিক ধর্মের অনেক কিছুই আমি নিরাসক্ত ভাবে দেখতে শিখেছি। পৌত্তলিকতা বড় আরটের একটি উৎস। দেশবাসী যদি দেশকে দেবী হিসেবে বন্দনা করে তবে তার ফলে যে কারও ধর্মচেতনা আহত হতে পারে একথা আমি ভাবতেই পারি না। বরং আমার তো মনে হয় এই মন্ত্রের কাব্যগুণ এবং সঙ্গীতময়তা যথার্থই অপূর্ব।

এই পর্যন্ত আলোচনা করার পর আমাদের প্রশ্নোত্তরের ধারাটা হয়ে উঠল এই রকম।

প্রশ্নঃ তাহলে আপনি মনে করেন 'আনন্দমঠ' পড়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে আহত বোধ করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই?

উত্তরঃ আছে বৈকি! আমার তো বরং মনে হয় যে এই বই পড়ে মুসলমানদের মনে স্বাভাবিক কারণেই

এ ডবলিউ মাহমুদ। আলোকচিত্র: সলিল রায়

"সংসারের সব কাজ করে একেবারে হাতে সময় পাইনা। কিন্তু তাই বলে ত্বকের যত্ন না করলেও তো চলে না। তাই আমি সেই অ্যান্টিসেপটিক ক্রীমটি লাগাই যেটি আমার মা বরাবর ব্যবহার করতেন—বোরোলীন। বোরোলীন অ্যান্টিসেপটিকের গুণে বারোমাস তিরিশ-দিন আমার ত্বক শুষ্কতা, গা-হাত-পা ফাটা, র‍্যাশ ওঠা ও রোদের ঝলসানির হাত থেকে সুরক্ষিত থাকে। শুধু তাই নয়, বোরোলীন রোজকার সাধারণ কাটা-ছেঁড়াতেও দারুণ কাজ করে। দেখুন, সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমার ত্বক কেমন সুস্থ ও সতেজ। সত্যিই বোরোলীন ছাড়া কি ভাবা যায়!"

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

ত্বকের সুরক্ষার জন্য
সত্যিই কার্যকরী ক্রীম

"ত্বকের অত দেখাশুনা করার সময় কোথায়? বোরোলীন আছে তাই নিশ্চিন্ত!"

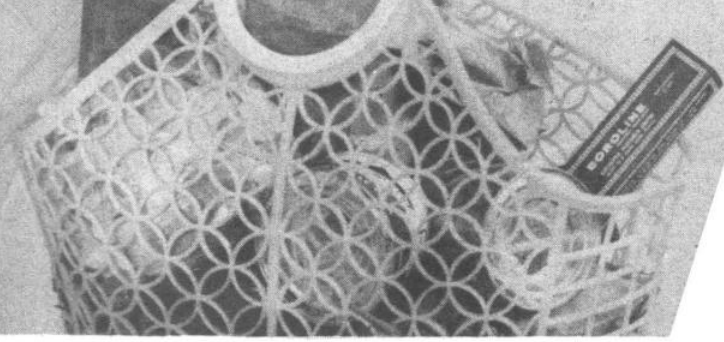

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আশা মহল নিউ আলিপুর কলকাতা ৭০০০৮৮

HTC-GDP-43881

ক্ষোভ জন্মাতে পারে।

প্রশ্ন : আর একটু খোলসা করে বলুন।

উত্তর : আনন্দমঠে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার ডাক দেওয়া হয়েছে। এই আদর্শ রূপায়িত করার জন্য লড়াইটা হওয়া উচিত ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে, কেননা ১৭৭২ সাল পর্যন্ত যদি আনন্দমঠের পটভূমি মনে করি তাহলে সেই সময়ের মধ্যে দেশের রাজশক্তি মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়ে ইংরেজের হাতে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আনন্দমঠের সন্তানদল ইংরেজকে মিত্রশক্তি হিসেবে দেখেছে এবং লড়াইটা ভুল পথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন : কিন্তু এখানে মুসলমান বলতে কি শাসকশ্রেণীকে বোঝাচ্ছে না? ইংরাজের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর সে তো একটা dejure ব্যাপার। নবাবী আমলের শাসনের ধারা এবং অত্যাচারী আমলারা তখনও বহাল। মুসলমান বলতে এদেরই বোঝাচ্ছে এবং সন্তান দলের লড়াইও আসলে এদেরই বিরুদ্ধে।

উত্তর : লড়াইটা যদি অত্যাচারী আমলাদের বিরুদ্ধেই হয়ে থাকে তাহলে সেই আমলাকুলের মেজরিটিও তো হিন্দু, সেটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া সন্তান দলের লড়াইটা যে কেবলমাত্র ক্ষমতাধারী তথাকথিত মুসলমান শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধেই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল আনন্দমঠ বই পড়ে তো তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সংসদ প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠা উদাহরণ হিসেবে দেখান যেতে পারে (পৃঃ ৭৪২, ৭৫০, ৭৫৭, ৭৫৯, ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৭৩, ৭৭৬, ৭৮৬ এবং ৭৮৭)। এগুলির উপর চোখ বোলালেই বোঝা যাবে যে এই জিগির সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানের বিরুদ্ধেও বটে। এক্ষেত্রে কোন রকম বাছবিচার করা চলে না।

এর পর অধ্যাপক মাহমুদ কতকটা আত্মগতভাবে বলে চললেন যে, আসলে যে সব হিন্দুরা এই বইয়ের মধ্যে তেমন কিছু আপত্তিকর বিষয় খুঁজে পান না তাদের কাছেই যদি আনন্দমঠের যে সব জায়গায় 'মুসলমান', 'মসজিদ' প্রভৃতি শব্দগুলি রয়েছে সেগুলি বাদ দিয়ে সেইসব জায়গায় যথাক্রমে 'হিন্দু' বা 'মন্দির' প্রভৃতি শব্দগুলি বসিয়ে, পড়তে দেওয়া হয়, তাহলে তারাও বুঝবেন এর মধ্যে আপত্তিজনক বিষয় কিছু আছে কিনা। এই রকমভাবে ছাপান একটি বিকল্প আনন্দমঠ যদি বাংলাদেশের হিন্দুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাহলেও অবস্থাটা বুঝতে দেরি হবে না। প্রসঙ্গক্রমে তিনি দুটি আলাদা রকমের খবর পরিবেশন করলেন। এক, আনন্দমঠের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ঢাকার সন্ত্রাসবাদী অনুশীলন দলের সংবিধান অনুযায়ী, সেই দলে মুসলমানের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। অধ্যাপক রজতকান্ত রায় সাম্প্রতিক এক গ্রন্থে (Mushirul Hasan সম্পাদিত Communal and Pan Islamic Trends in Colonial India) ইনটেলিজেনস ব্রানচের রেকরড ঘেঁটে এই তথ্য সপ্রমাণ করেছেন। দুই, সম্ভবত ১৯৪২ সালের কোন এক সময়ে কয়েক ব্যক্তির প্রস্তাব মত আনন্দমঠ এবং স্যার যদুনাথ সরকারের ইংরাজিতে লেখা 'আউরঙ্গজেব'-এর তৃতীয় খণ্ড নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই চেষ্টা চালিয়ে গেলে বই দু'খানি হয়ত নিষিদ্ধও হতে পারত। কিন্তু নাজিমুদ্দিন এবং ফজলুর রহমানের হস্তক্ষেপের ফলে এই উদ্যোগ মাঝপথেই থেমে যায়। হয়ত এমনও হতে পারে যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উসকে দেওয়ার জন্য কাজে লাগান যেতে পারে এমন দু'খানি খাসা বই তারা উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবেই জীইয়ে রাখতে চেয়েছিলেন।

স্যার যদুনাথের প্রসঙ্গ এসে পড়ায় আমি বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানতে চাইলাম। অধ্যাপক মাহমুদ জানালেন যে গান্ধীজীর ডাকে খিলাফৎ আন্দোলনের সুবাদে যে সময় সাম্প্রদায়িক ঐক্য সবে মাত্র গড়ে উঠছে সেই সন্ধিক্ষণে ১৯২১ সালে স্যার যদুনাথ তাঁর তৃতীয় খণ্ড আউরঙ্গজেবের ৩৪ নং অধ্যায়ে ইসলাম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সহসা কিছু আপত্তিকর উক্তি করে বসলেন। ফলে এই বইটিও মুসলিম সমাজকে আহত করেছিল।

প্রশ্ন করলাম, কিন্তু এ কথা তো সত্যি যে জেহাদ, পররাজ্য জয়, বিধর্মীকে ইসলামে ধর্মান্তরকরণ-এ সবই ইসলাম ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত?

অধ্যাপক মাহমুদ বললেন, তাতে কিছু যায় আসে না। চোদ্দশ বছর আগে আরব দেশে সে যুগের রীতি অনুযায়ী যে বিধান দেওয়া হয়েছিল যুক্তির খাতিরে তাকে সত্য বলে মেনে নিলেও, সেই বিধান যে বিংশ শতাব্দীর মুসলমান সমাজকেও পুরোপুরি প্রভাবিত করে এসেছে এমন কথা ভাবার কোন কারণ নেই।

উত্তরের খেই ধরে আবারও প্রশ্ন করি : তা হলে বঙ্কিম আনন্দমঠে যা লিখেছিলেন সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? কিংবা সেই আপত্তিকর মানসিকতা, যুক্তির খাতিরে তা ছিল বলে মেনে নিলেও সেটা কি আমরা যথেষ্টভাবে পেরিয়ে আসিনি?

ঠিক তাই, অধ্যাপক মাহমুদ জবাব দিলেন, বঙ্কিমের পক্ষে হয়ত সেইটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তাঁর মতের শরিক এখন আমরা কেউ-ই নই। দেশ বিভাগের আগে ও পরের অবস্থা বিবেচনা করে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অন্তত একটি কথা সজোরে বলা যেতে পারে, তা হল এই, আমাদের দেশে পরধর্ম সহিষ্ণুতা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ অনেক পরিমাণে উন্নত হয়েছে। আমরা ক্রমে ক্রমে সকলেই বুঝতে পারছি যে, আসলে ধর্মের বিভিন্নতাটা কিছু নয়। একটা প্রকৃত Working class consciousness গড়ে উঠলেই যথার্থ ঐক্যের ভিত্তি রচিত হবে। Unity in diversity-র দেশ ভারতবর্ষে আসল ঐক্য, দারিদ্র্য—সর্বজনীন দারিদ্র্যের ঐক্য।

: তাহলে আপনি কি মনে করেন দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আনন্দমঠ সম্পর্কে সরোজ মুখার্জির মন্তব্য সর্বাংশে যুক্তিযুক্ত?

একটু থেমে অধ্যাপক মাহমুদ জবাব দিলেন : নিশ্চয়ই। উপন্যাস হিসেবে একটা মহান সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও আনন্দমঠ যে জাতীয় সংহতির সহায়ক নয়, সে কথা নিজে একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সরোজবাবু যে সাহস করে বলতে পেরেছেন এইখানেই তার জিত, সকল সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে তার মুক্ত মনের পরিচয়। সরোজবাবুর মন্তব্য যে সত্যাশ্রয়ী এবং বস্তুনিষ্ঠ মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছে তা যদি প্রাক-স্বাধীনতার যুগে বাঙালি হিন্দু মানসে বর্তমান থাকত তাহলে আমার মনে হয়, বঙ্গদেশ ভাগ নাও হতে পারত। □

সাক্ষাৎকার :
লাডলীমোহন রায়চৌধুরী

শিলাদিত্য

ফেব্রুয়ারি সংখ্যার কয়েকটি বিশেষ রচনা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
টোমাস মান : ধ্রুপদী কথক

সন্তোষ রাণা
দাও ফিরে সে অরণ্য

রেণুপদ ঘোষ
ঈশ্বর গুপ্ত ও কলকাতার ঠাকুরবাড়ি

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্যালিবানের পৃথিবী

উৎপলকুমার দে
শুক্র ও পৃথিবী : দুই যমজ বোনের কথা
।। উপন্যাস ।।

কবিতা সিংহ
নগ্ন নির্জন হাত
।। গল্প ।।

কণা বসু মিশ্র
বৃত্তের মধ্যে

তাপস গঙ্গোপাধ্যায়
ভয়
।। স্মৃতিচারণ ।।

বিমল কর
আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা

সদ্যপ্রয়াত আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পর্কে দুটি বিশেষ রচনা

গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোয় সরকারি দলের সঙ্গে সমান দায়িত্ব আছে বিরোধী দলেরও। বিধানসভা, লোকসভা, রাজ্যসভা যে কোন স্তরেই হোক সামগ্রিক জনমত গঠনের কাজটা সঠিক পথে চালানোর দায়িত্ব সরকারের যতখানি, তার চেয়েও আরো কিছু বেশি বিরোধী দলের। সরকারি শাসন যন্ত্র, অর্থ এগুলো বিরোধী দলের হাতে থাকে না ঠিকই কিন্তু সেই কারণেই এই সরকারি শাসন ব্যবস্থার ত্রুটি সচেতনতার সঙ্গে লক্ষ্য করার ও সঠিক পথে জনকল্যাণের স্বার্থে নিয়ে যাবার দায়িত্ব বিরোধী দল ও নেতাদের।

সারা ভারতের কথা না ভেবে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের দিকে একটু চোখ রাখলেই সারা ভারতের বিরোধী দলগুলির বর্তমান ভূমিকা নিয়ে চিন্তার কারণ দেখা যায়। সাধারণ মানুষ যারা রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ জড়িত নন তাদের থেকে শুরু করে যারা সচেতন রাজনৈতিক নেতা তারা পর্যন্ত সকলেই কিন্তু সমস্বরে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলগুলির প্রতি কোনভাবেই আস্থাশীল হতে পারছেন না।

পশ্চিমবঙ্গে মোট ২৯৪টি আসনের মধ্যে গোষ্ঠীগত ভাবে সরকারি পক্ষ ২৩৮টি আসনের অধিকারী। বিরোধী গোষ্ঠীতে সেখানে ৫৬জন। মুখ্য দল হিসেবে সি পি আই এম ১৭৪টি, ফরোয়ার্ড ব্লক ২৮টি আর এস পি ১৯টি সি পি আই সহ ছোট্ট দলগুলি ১৭টি। আর বিরোধী গোষ্ঠীর প্রথমে কংগ্রেস (ই) দল ৪৯টি আসন অধিকার করে আছে, সেই সঙ্গে কংগ্রেস (স) ৪টি আর গোর্খা লীগ ১টি আসন নিয়ে একটি গোষ্ঠী। এস ইউ সি আই তৃতীয় পক্ষর ভূমিকায় ২টি আসন জিতে বিরোধী বেঞ্চে বসে। এই অবস্থায় সরকারি হিসেবে বিরোধী দল কংগ্রেস (ই)। বাস্তবচিত্র বলে ২৩৮টি কণ্ঠস্বরের সঙ্গে এস ইউ সি-কে নিয়ে মোট ৫৬টি কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যাবার সুযোগ আছে। কিন্তু আলোচনার সময় হিসেবে বিরোধী দলগুলি সংখ্যায় কম আসনের অধিকারী হলেও বক্তব্য রাখবার সুযোগ পান।

বক্তব্য রাখার ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্বের অভাবে বিরোধী দলগুলি বর্তমান বিধানসভা ও '৭৭ সালে নির্বাচিত বিধানসভায় যথেষ্ট ভাবে নিজেদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। বিধানসভায় হিসেবে দেখা যাবে ট্রেজারি বেঞ্চ ও অপজিশন বেঞ্চের গড় অনুপস্থিতির হারেও খুব একটা তফাৎ হয় না। অতএব বিরোধীদের বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি করে। আমরা বিরোধীদের এই হতাশাজনক অবস্থা নিয়ে কথা বলার জন্যই রাজ্যের কয়েকজন বিরোধী নেতার কাছে গিয়েছিলাম। এখানে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশিত হল।

মাননীয় বিরোধী সদস্য

বিরোধী দল বা নেতাদের প্রতি সাধারণ মানুষের এই অনাস্থার কথা নিয়ে হাজির হওয়া গেল এমন কয়েকজন তরুণ রাজনৈতিক নেতার কাছে যারা কেউ বিধানসভার ভিতরে এবং কেউ বাইরে থেকে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধী দলের মূলধারার সঙ্গে জড়িত।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে কংগ্রেস (ই) পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক। বর্তমান বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দলের যথেষ্ট মুখর এক নেতা। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোয় বিরোধী দলের ভূমিকা কি ও ক্ষমতা কতটুকু? এর উত্তরে 'পরিবর্তন'কে তিনি বলেন, 'আগে একটু ভূমিকার দরকার। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলের ভূমিকা সাধারণ মানুষের কাছে ঠিক ঠিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হয়নি। আমি মনে করি এজন্য শাসক দল ও বিরোধী দল উভয়েই দায়ী। শাসক দলের যেমন গঠনমূলক শাসন ব্যবস্থা চালনা করার দায়িত্ব আছে তেমনি অলিখিত ও অঘোষিত দায়িত্ব আছে দায়িত্বশীল বিরোধী দল তৈরি করারও। আমার মনে হয় না সেটা ঠিকভাবে করা হয়েছে, এবং সেই জন্যই সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি যে, বিরোধী দলের ভূমিকাটি কি? স্বীকৃত বা প্রতিষ্ঠিত না হলেও বিরোধী দলের যে একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে আমি তা অস্বীকার করি না। আমি সরকারে থাকাকালীন তখন এবং এখন বিরোধী দলে থেকে উপলব্ধি করেছি এ ব্যাপারে একটা বিরাট দায়িত্ব আছে। হয়ত জনসাধারণ মিছিল করে গিয়ে তাদের কাছে দাবি জানায় না কিন্তু তাদের কাছেও একটা দাবি থাকে।

সরকারি দলকে যেমন নির্বাচনের সময় জবাব দিতে হয় কটা চাকরি দিয়েছে কটা ইনড্রাস্ট্রি করেছে। তেমন জনসাধারণের একটা অব্যক্ত দাবি বিরোধী দলের কাছেও থাকে। যেখানে বিরোধী দল দায়িত্ব পালন করতে পারে না, সেখানে ভোটের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া ধরা যায়।

সরাসরি ভোট বলছি এই কারণে যে আমরা সবাই এটাকেই ব্যারোমিটার ধরে পলিটিকস করি। এখন আমাদের মধ্যে এমন একটা ধারণা অনেকের আছে যে এখন আমরা বিরোধী দলে আছি বলে কোন কাজ করার নেই। অথবা নেতিবাচক কিছু কাজ করলেই হয়ে গেল। এটা আদৌ ঠিক নয়। এটা কিন্তু আমাদের অর্থাৎ বিরোধী দলের সংগঠনের এবং কর্মীদের মধ্যে বোঝা দরকার যে আমাদের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে যেটা কোন অংশেই কম নয়।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়। আলোকচিত্র : অশোক বসু

পরিবর্তন: বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে বিরোধী দলগুলি অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে বলে আপনি মনে করেন?

সুব্রত: আমি মনে করি না। তবে একথা ঠিক দীর্ঘদিন সরকারি দলে থাকার ফলে কখন কখন কেউ কেউ বিরোধী দলে থাকলে এ কথা মনে করেন। এবং করেন বলেই দায়িত্বটা উপলব্ধি করতে পারেন না। আর উপলব্ধি করতে পারেন না দেখেই দায়িত্বটা সম্পাদন করতে যান না। সেই কারণেই এই ধারণাও সৃষ্টি হয়। গত কয়েক মাস ধরে বিরোধী দলে থেকে আমি দেখেছি—আমাকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়, নিয়মিত অফিস করতে হয় এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মত রেগুলার পড়াশুনা করতে হয়। বিভিন্ন সিলেকট কমিটিতে আমাদের গুরুত্ব বেশি। কারণ সরকার তো একটা প্রস্তাব পেশ করে দেয় তাকে সাহায্য করার জন্য তিন'শ অফিসার চার'শ অ্যাডভাইসর আছেন, কিন্তু আমরা যখন বিভিন্ন কমিটিতে কোন বিল বা নানা রকম আইন নিয়ে আলোচনা করি তখন অতীতের নজির দেশবিদেশের নানারকম আইন পড়াশুনা করতে হয়। এবং আমাদের ভূমিকাই মুখ্য থাকে। আমাদেরই গঠনমূলক প্রস্তাব নিয়ে হাজির হতে হয়। এটা কেবল নেতিবাচক বিরোধিতা নয়—গঠনমূলক প্রস্তাবনার মূল্য বিরোধী দলের কাছে অপরিসীম।

পরিবর্তন: গত ছ' বছরে আপনার দল এমন কি কাজ করেছে যার জন্য আপনাদের যোগ্য বিরোধী দল হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে?

সুব্রত: বিধানসভার ভিতরে আমরা অনেকগুলি কাজ করতে পেরেছি। কিন্তু বাইরের চেহারা হতাশা ব্যঞ্জক। এই দেখুন না আমি চারচিলের একটা কথা বিশ্বাস করি 'অপজিসন মাসট অপোজ' আমরা তা করেছি। কিন্তু দায়িত্ব জ্ঞানহীন অপজিসন নয়। গত অধিবেশনে একটা কো-অপারেটিভের উপর কমপ্রিহেনসিভ বিল এসেছিল। লং টারম ডিবেট। আমাকে যথেষ্ট পড়াশুনা করে যুক্তি দিয়ে সরকারি প্রস্তাবকে দেখতে হয়েছে। আমার যুক্তির চাপে পড়ে আমার তিনটে প্রস্তাব সরকার মেনে নিয়েছেন। আবার গত বাজেট অধিবেশনে, যেখানে সরকার চাষের বাজেট প্রেসিং-এ ভুল ছিল সেখানেও আমাদের চাপে পড়ে সরকারকে ঐতিহাসিকভাবে বাজেট

বিতর্ক দু'দিনের জন্য বন্ধ রাখতে হয়েছিল। প্রস্তাবটা আমিই তুলেছিলাম কানাইবাবুর একটা কেস নিয়ে। এই বাজেট প্লেসিং সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী হয়েছিল। যদি Economical Budget পাশ না হয় তবে, সরকার-কে পদত্যাগ করতে হয়। সরকার বাধ্য হয়েছিলেন এডভোকেট জেনারেলকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে। সরকার সংবিধান বিরোধী কাজ করেছিলেন, আমরা ঠিক জায়গায় আক্রমণ করতে পেরেছি। আমাদের পারপাস সারভ হয়ে গেল। আমরা এ জিনিস নিয়ে কোরটে যেতে পারতাম।

পরিবর্তন ঃ কোরটে কি বিধান-সভায় আলোচ্য বিষয় নিয়ে যাওয়া যায় ?

সুব্রত ঃ কেরল মাত্র অর্থকর ব্যাপারে যদি সরকার কোন ভুল করেন এবং সংবিধান বিরোধী হয় তবে কোরটে যাওয়া যায়।

পরিবর্তন ঃ বিধানসভার বাইরে আপনার কাজ.....

সুব্রত ঃ সত্যিই হতাশাব্যঞ্জক। এরজন্য দিললিকে আরও সিরিয়াস হতে হবে। আসলে কি জানেন;বিধান সভার ভেতরেই আমাদের ক্ষমতা সীমিত। আমাদের ৪৯ জন সদস্য আছেন। কিন্তু এর মধ্যে বেশিরভাগই, আমি চিপ হুইপ হিসেবে স্বীকার করছি, বিরোধী দলের কাজ সম্পর্কে সিরিয়াস নন। এমনকি আগে মন্ত্রী ছিলেন এমন সদস্যরাও গুরুত্ব বোঝেন না। এ'রা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন কিন্তু বোঝেন না যে ৪৯ জন একসঙ্গে বিরোধিতা করেন তার ইমপ্যাকটটা কত।

এদের ধারণা নেই কেন না এ'রা যে দীর্ঘদিন শাসক দলেই ছিলেন। এদের বোঝানো যায় না যে, বিরোধী দলের একজন সাধারণ সদস্যর ক্ষমতা কোন-অংশেই মন্ত্রীর চেয়ে কম নয়। এদের জন্যই সরকার বহুক্ষেত্রে ইয়েসপনসিবিল কাজ করার সুযোগ পায়। এই দেখুন না পাবলিক অ্যাকাউনটস কমিটির হিসেব পরীক্ষার কাজ আজ দশ বছর পেনডিং হয়ে আছে। এখন বিরোধী দলই যদি সচেতন না হয় তবে কাজটা কি করে হবে ? অনেকেই এখন পারটটাইমার। কোরুট থেকে জ্যাকেটটা খুলে একবার বিধানসভায় এসে মুখ দেখিয়ে যান। ইন্দিরাজীর উচিত এই সব এম এল এ-দের একটা ট্রেনিং ক্লাস খুলে শেখান···

পরিবর্তন ঃ আপনার দলের অনেক এম এল এ-র অভিযোগ যে সরকারি তরফ থেকে আপনাদের বিরোধী দল হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয় না—আপনি কি বলেন ?

সুব্রত ঃ সরকারি তরফের মর্যাদার কোন দরকার নেই। মর্যাদা আসে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। আমি মনে করি না মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যপাল সব বিষয়ে আমাকে ডাকবেন। বিরোধী দলের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল জনসাধারণ। এবং আমাদের দলের মধ্যেই এমন রক্ষণশীল এম এল এ-রা আছেন। তাই তারা বিরোধী দলের ভূমিকা সফল করতে পারছে না।

আবার সরকারের বিরুদ্ধেও কিছু বলার থাকে যেমন, বাসভাড়া বাড়ছে, জলকর বসছে, খরা ইত্যাদি ইকনমিকাল ইস্যু গুলোতে সরকারের উচিত বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা করা। ডাঃ রায়ের আমল থেকে হয়ে আসছে। কিন্তু এখন আমি বলেছি একটা 'শরট টারম এসেমবলি সেশান' হোক কিন্তু সরকারি তরফের কোন উত্তর নেই। আর আমাদেরও সরাসরি আলোচনার, ক্ষোভ দেখাবার জায়গা থাকে না। এখন যদি কেবলমাত্র কাগজের মাধ্যমে আমরা আন্দোলন করি সেটা হয়ত ঠিক হবে না, কেননা আমরা আসল সরকারি বক্তব্যটাই জানি না।

এই দেখুন না জলকর। মিনিমাম সিভিক এমিনিটি হচ্ছে জল। কলকাতায় ২০০ মিলিয়ন গ্যালন জল কম সরবরাহ হয়। এক্ষেত্রে আমি যে অঞ্চল থেকে নির্বাচিত সেখানে লোকে এক টাকায় এক বালতি জল কেনে, একমানুষ সমান গর্ত আছে প্রত্যেকটি বাড়ির কলের তলায়। এখন যদি সেই লোকগুলোর কাছে জলের ট্যাকস চায় তবে কলকাতায় 'রায়ট' হয়ে যাবে। অথচ আমাদেরও কোন সুযোগ নেই—জনসাধারণের ক্ষোভটা সরকারের কাছে তুলে ধরার। এখন সবটা না জেনে আমরা যদি আন্দোলনে নামি তবে ইয়েসপনসিবল কাজ হয়ে যায় বিরোধী দলের।

★

প্রদীপ ভট্টাচার্য। কংগ্রেস (স) গোষ্ঠির নেতা। ৭২-৭৭ সাল আমলে মন্ত্রিত্ব করেছেন। তার বক্তব্য খুব পরিষ্কার।

প্রদীপবাবু 'পরিবর্তন'কে বলেন,—আজ যখন একটা সামগ্রিক আন্দোলনের পরিবেশ তৈরি তখন রাজ্যের মূল বিরোধী দল কংগ্রেস (ই) চুপ করে আছে—আর তার ফলে সাধারণ মানুষের আস্থা বিরোধী দলগুলির ওপর কমে যেতেই পারে।

একদলীয় শাসন সম্পর্কে প্রদীপবাবু বলেন—মানুষকে যদি ভরসা, আস্থা না দেওয়া যায় তবে মানুষ যেখানে সুবিধার সামান্যতম চেহারা দেখবে সেদিকেই চলে যাবে। এরজন্য তারা দায়ী নয়

দায়ী হচ্ছে উপযুক্ত বিরোধী নেতৃত্ব। আজ যেহেতু সর্বভারতীয় পর্যায় একটা পূর্ণাঙ্গ দল নেই তাই ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তা করে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল তৈরি হচ্ছে। এদের বক্তব্য কেন্দ্রের কাছ থেকে তোমাদের জন্য কিছু ছিনিয়ে আনতে পারব। এই ট্রেনড ঠিক নয়। বরং গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রদীপবাবু মনে করেন দীর্ঘদিন ধরে শাসকদলে থাকার ফলে আজকে যারা পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দল তাদের মানসিক ও সাংগঠনিক দুর্বলতার সুযোগ পাচ্ছেন বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার। তাদের মত ছোট একটি দলের একক চেষ্টায় যতটুকু বিরোধিতা বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে করার দরকার ততটুকু তারা করছেন, কিন্তু এই পদ্ধতিতে বিরোধী দলের যোগ্য ভূমিকা নিতে সময় লাগবে।

★

কংগ্রেস (স) দলের সভাপতি প্রাক্তন এম পি প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীর কাছেও একই প্রশ্ন নিয়ে 'পরিবর্তন' হাজির হয়। প্রিয়রঞ্জনের বক্তব্য—'সম্প্রতি আমরা ১৪টি জেলার ফিফটি পারসেনট ব্লক থেকে রিলিফের ডিসট্রিবিউশনে কারাপশন হচ্ছে বলে অভিযোগ পেয়েছি। আমরা আগামী ফেবরুয়ারিতে পঞ্চায়েতগুলির সামনে আন্দোলন করব আর জনসাধারণের সামনে পঞ্চায়েতের দুর্নীতির ছবি তুলে ধরব।'

পরিবর্তন ঃ এই প্রোগ্রামটা কি বিরোধীদল হিসেবে বিধানসভার বাইরে একটি অবশ্য করণীয় কাজ ?

প্রিয়রঞ্জন ঃ প্রচণ্ড দরকারি। এই জন্য যে, বিধানসভার ভেতরে বিরোধী দলকে কোন কাজ করতে দেওয়া হয় না। যাও হয় তার সামান্য অংশ বাইরে আসে এবং তাও ঘাত প্রতিঘাতে পিপলের সঙ্গে কমিউনিকেট করা হয় না। আমি চাইছি ডিরেকট গ্রাসরুটে গিয়ে 'পিপল' কে সচেতন করতে। পিপল যদি বুঝতে পারে যে আমাদের ইস্যু নিয়ে আমাদের পাশে এসে কেউ দাঁড়িয়েছে **then they will fight**, না হলে কেউ ফাইট করবে না। ওদেরকে ভয় দেখিয়ে থ্রেট করে নানারকম এলিয়রমেনট দিয়ে আটকে রাখা হচ্ছে। সে কারণে পঞ্চায়েত অফিসগুলোর সামনে প্রোগ্রাম করবো ঠিক করেছি।

পরিবর্তন ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলের কতটুকু ক্ষমতা আছে বর্তমান গণতান্ত্রিক পটভূমিকায় ?

প্রিয়রঞ্জন ঃ Well, এটা একটা ভাল প্রশ্ন করেছেন। খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় সারা ভারতে এমন একটা পিকচার পেইনট করে রেখেছে যে ওয়েসট বেঙ্গলে ডেমোক্রেসি দারুণভাবে চলছে এবং এখানে বিরোধীদের ভূমিকা খুব মারাত্মক। কিন্তু আমি এখানে বলবো রিয়েল সেনস অব অপজিশন, Left front গভরনমেনটের কাছ থেকে যে কোঅপারেশন পাবার কথা ছিল তা nil. যেমন আমি কতকগুলি instance দিচ্ছি, Public opinion তৈরির ক্ষেত্রে ন্যাশন্যাল মিডিয়াগুলো যাই করুক কিন্তু ডিস-ট্রিকট নিউজ পেপারস বা ক্ষুদ্র সংবাদপত্র যদি বিরোধী দলের বক্তব্য প্রকাশ করে তবে বিজ্ঞাপন কেটে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। এটা প্রেস বিলের চেয়েও খারাপ। জনমত তৈরির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে।

দ্বিতীয়ত ঃ বড় কাগজে যদি কিছু সরকারের বিরুদ্ধে লেখা হয় তবে তাকে Publicily threat করা হয় যে, আমরা অমুক কাগজকে পরোয়া করি না, এটাও একটা অ্যাটাক অন ডেমোক্রেটিক ইনসটিটুশন।

তৃতীয়ত ঃ যে সমস্ত রাজনৈতিক বিরোধীদলগুলি রয়েছে তাদের কোন কথাই শোনা হয় না। গত ছ'বছরে যে সমস্ত আন্দোলন হয়েছে এমন একটাও পাওয়া যায় না যেখানে পুলিশ লাঠি চালায়নি কিংবা আন্দোলনের আগের দিন রাতে ছেলেদের মিথ্যা চার্জে পুলিশ তুলে নিয়ে যায়নি। পুলিশের গুলিতে তো লোক মারাই গেছে।

শ্রমিকদের আন্দোলন স্তব্ধ, যার নেতৃত্ব দেবার কথা সিটুর আর জুটের INTUCর। রিফিউজিদের মরিচ-ঝাঁপির আন্দোলন কিভাবে স্তব্ধ করা হয়েছিল তা বাংলার মানুষ জানেন। গ্রামাঞ্চলে গরিব মানুষ, ভূমিহীন কৃষকদের আন্দোলন করতে দেওয়া হচ্ছে না 'ডোল' আর রিলিফের লোভ দেখিয়ে। যখনই তারা হৈ চৈ করে তখনই তাদের বলা হয় কেন্দ্র থেকে 'ডোল' কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ইস্যু নিয়ে যখন আন্দোলন করতে কংগ্রেস কর্মীরা গিয়েছিল তাদের মধ্যে ৪০ থেকে ৪৫ জন গত ক বছরে খুন হয়েছে।

বিধানসভার ভেতরে আমরা বহুবার বহু ইস্যু তুলতে গিয়ে দেখেছি স্পীকারের ইচ্ছা থাকলেও সরকারি

দলের সদস্যদের হট্টগোলে তুলতে দেওয়া হয়নি এবং বিধানসভার বাইরে সমস্ত দলের সহযোগিতার কথা আমরা বারবার বলেছি। কিন্তু খরার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী খরার ছ'মাস বাদে মিটিং ডাকলেন বটে কিন্তু কোন সর্বদলীয় কমিটির বা কোন সহযোগিতার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেননি।

এইসব মিলিয়ে আমি বলতে চাই বিরোধী দল কোন কাজ করুক বা রোল প্লে করুক এটা left front সরকার চান না।

আন্দোলনের নেতৃত্বে প্রিয়রঞ্জন ও সুদীপ

পরিবর্তন ঃ এখানে বিরোধীদলের ভূমিকা কি হওয়া উচিত ?

প্রিয়রঞ্জন ঃ এখানে বিরোধীদলের ভূমিকা যেটুকু আছে তার থেকে অনেক বেশি করার ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এখানে মূল বিরোধীদল হচ্ছে কংগ্রেস (ই)। কংগ্রেস (ই) মূল বিরোধী দল হওয়া সত্ত্বেও তাদের যে ভূমিকা ছিল তারা সেটুকু করে উঠতে পারেনি, তার বড় কারণ তারা ভাবে তারা দিললিতে রুল করছে। এখানে বিরোধী দল হিসেবে যদি তেমন বেশি কিছু করে তবে তার প্রতিক্রিয়া অন্য State গুলোতে পড়তে পারে। তারা বোধ হয় এরকম একটা Complex-এ ভুগছে। তা না হলে এখন যা পরিস্থিতি তাতে কংগ্রেস (ই)-র নেতৃত্বে একটা বড় আন্দোলন তৈরি হতে পারে। এবং তারা যেহেতু এগিয়ে আসছে না তাই এই 'ভ্যাকুয়ামটা' আর অন্য দলগুলোর পক্ষে মেজর ইনিসিয়েটিভ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

পরিবর্তন ঃ সাধারণ মানুষ কি বহুদলীয় প্রথার প্রতি আস্থা হারাচ্ছে তা না হলে কেন্দ্রে বা কোন কোন রাজ্যে একদলীয় শাসন এভাবে কায়েম হচ্ছে কেন ?

প্রিয়রঞ্জন ঃ বহুদলীয় প্রথার প্রতি আস্থা হারাচ্ছে—না বলে আমি বলব বহু দল যে ভাবে বছরে বছরে নানা দলে রূপান্তরিত হচ্ছে গত ৭/৮ বছর ধরে তার জন্য কোন একটা দল যে সত্যিই দল এবং তারা যে আদর্শে বিশ্বাসী তাতেই থাকবে এই বিশ্বাস মানুষ হারাচ্ছে। আর তার ফলে বড় দলগুলির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। যত ভুলই থাকনা কেন এটা একটা কারণ। তাই আজকের যে সব বিরোধী দলগুলি কোন একটি বিষয় বা আদর্শ আঁকড়ে না থাকতে পারে অন্তত কমপক্ষে দশটা বছর, তাহলে ভারতের রাজনীতিতে এমন একটা অবস্থা হবে যেখানে একটা বড় বিশেষ দলের ভুলকেও মানুষ মেনে নিতে বাধ্য হবে, অন্য কোন অবলম্বন নেই বলে।

★

আমজাদ আলী। সর্দার আমজাদ আলী রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্যএবং ইউ এন ও-তে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি বর্তমানে কংগ্রেস (ই) একজন সক্রিয় নেতা। সর্দার আলী 'পরিবর্তন'কে বলেন 'পশ্চিমবঙ্গে সেরকম বিরোধী দলও নেই বিরোধী নেতাও নেই। দল বলতে কংগ্রেস (ই) একটা দল আছে, কিন্তু যেমন সংগঠিত আকারে থাকার কথা তেমন নেই। দল চলে একটা নেতৃত্ব মারফৎ। দল সংগঠিত নাহলে যেমন ভোটের বাকসে ভোট আনা যায় না তেমন কোন আন্দোলনও করা যায় না। দুর্ভাগ্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গে সেরকম কোন নেতা নেই, এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পরিবর্তন ঃ আপনি কি জানেন পাবলিক অ্যাকাউনটস কমিটির মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বডির হিসাব পরীক্ষা গত দশ বছর হয়নি, কোন বিরোধী-দলের নেতা এ বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট সময় দিতে পারেননি। অথচ কংগ্রেস (ই) বিরোধীদলের মর্যাদা দাবি করে এ বিষয় আপনার মন্তব্য কি ?

আমজাদ আলী ঃ বর্তমান বিধান-সভায় কংগ্রেস (ই)-র পক্ষ থেকে পাবলিক অ্যাকাউনটস কমিটিতে কে আছেন আমি জানি না। তবে আমি নিজে সংসদ সদস্য থাকার সময় পাবলিক অ্যাকাউনটস কমিটির সদস্য ছিলাম। চেয়ারম্যান হিসেবে সেখানে ডঃ হীরেন মুখার্জি, কে এল গুপ্তাকে দেখেছি। এঁরা সবাই বিরোধী দলের নেতা এবং এঁদের পরিচিতির অপেক্ষা রাখে না। ধরুন আমি একজন সাধারণ সদস্য হিসাবেও যে সাব কমিটিতে ছিলাম, সেখানেও আমাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়েছে, কনট্রোলার অব অডিটর জেনারেলের রিপোরট দেখতে হয়েছে এবং রিপোরটের ভিত্তিতে সরকারের কাছ থেকে আমাকে তথ্য নিতে হয়েছে। সুতরাং এখানে

আমজাদ আলী। আলোকচিত্র : অনিল রায়

পাবলিক অ্যাকাউনটস কমিটির চেয়ারম্যান যদি হিসেব না দেখে থাকেন তাকে পুঁথিগত পাবলিক অ্যাকাউনটস কমিটি বলাই ভাল।

পরিবর্তন : পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিরোধী দল বা সরকার কার দ্বারা বেশি বঞ্চিত হচ্ছে ?

আমজাদ আলী : বিরোধী দল যদি উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে না পারে তবে সরকারের স্বৈরাচারী বা স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ থাকে। এক্ষেত্রে বিরোধী দল যদি উপযুক্ত না হয় তবে জনসাধারণের বঞ্চিত হবার সুযোগ তাদের কাছ থেকেই বেশি।

পরিবর্তন : বহু দলীয় সংসদীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কি সাধারণ মানুষ রায় দিচ্ছেন ?

আমজাদ আলী : আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা দেখলে তাই মনে হয়। কিন্তু এর সুফল ও কুফল দুটোই আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশের মানুষ এর কুফলটাই দেখেছেন। এক দলে নির্বাচিত হয়ে অন্য দলে যোগ দেওয়া, জনসাধারণ এটাকে পছন্দ করেন না। যে চুলচেরা অর্থনৈতিক প্রোগ্রামের ভিত্তিতে এই দলগুলি হয় সেগুলি জনসমক্ষে খুব পরিষ্কার নয়। যেমন দেখুন না মারকসবাদের ওপর নির্ভর করে আমাদের দেশে কত দল রয়েছে। কিন্তু মারকসবাদের দিকদর্শন ও কার্যসূচী তো একটাই। এই চুলচেরা ভাগ পছন্দ করেন না বা বোঝেন না দেখেই সাধারণ মানুষ একদলীয় শাসনের দিকে ঝুঁকছেন।

পরিবর্তন : এটা কি গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ ?

আমজাদ আলী : একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কখনোই শুভ নয় গণতন্ত্রের পক্ষে। সেখানে যথেষ্ট শক্তিশালী বিরোধী দলের প্রয়োজন আছে।

★

বিগত বিধানসভার বিরোধী দল কংগ্রেস (ই)-র নেতা ভোলানাথ সেন। শ্রী সেনের সঙ্গে কথা বলে এটাই পরিষ্কার যে,দল হিসেবে কংগ্রেস (ই)-র যে ধরনের বিরোধিতা করা দরকার তার সুযোগ তাদের নেই, কেননা কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ। শ্রী সেন মনে করেন Public Accounts Committee ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির বিধানসভার ভেতরে গুরুত্ব পাওয়ার সুযোগ আছে, বিরোধী দল হিসেবে কংগ্রেস (ই) তার প্রতিনিধি পাঠিয়েই সেক্ষেত্রে কর্তব্য সম্পাদন করেছে। ☐

ভোলানাথ সেন

সাক্ষাৎকার : শ্যামল বসু

নারী দুনিয়া

শীতে রাঁধুন নানা রকম

এখন শীত—নানা রকমের ফুল, ফ্লাওয়ার শো, বাজারে নানা নতুন শাকসবজি, পথে-ঘাটে নয়নাভিরাম বর্ণাঢ্য সাজগোজ—পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলেই চিড়িয়াখানা, ডায়মনডহারবার, পিকনিক। এই তিন চারটে মাসের প্রতীক্ষায় থাকি আমরা সকলেই। শীতেই তো খাওয়া দাওয়া—শীতেই তো সাজগোজ।

সহজলভ্য উপাদানে শীতের দু-চারটে রান্না পরীক্ষা করে দেখুন না !

ফুলকপির রোসট

দুভাবে করা যায়, স্বাদও দু'ধরনের। প্রথম প্রণালী—মাঝারি সাইজের ফুলকপি ১, মাঝারী টম্যাটো ২, বড় পেঁয়াজ ২, ২ কোয়া রসুন, চায়ের চামচের এক চামচ চিনি, পরিমাণমত নুন, শুকনো লংকা ২, হলুদ ছোট এক টুকরো, দেড় ইঞ্চি মাপের আদা ১ টুকরো, ১০০ গ্রাম টক দই, চায়ের চামচের ২ চামচ জিরা, পরিমাণমত গরম মশলার গুঁড়ো, মাখন ৫০ গ্রাম এই হচ্ছে উপকরণ। ফুলকপির ডাঁটা ছাড়িয়ে, শুধু ফুল অংশটি আস্ত রেখে কেটে ধুয়ে নিন। পেঁয়াজ, রসুন, আদা, জিরে, লংকা, হলুদ একসঙ্গে মোলায়েম করে পিষে নিন। কপিটিতে ঐ পেশা মশলা, দই, নুন মিষ্টি ভাল করে চেপে চেপে মাখাতে হবে। অভেন থাকলে বেকিং ডিসে মাখন গালিয়ে কপিতে মাখিয়ে বেক করুন। আর যদি অভেন নাও থাকে তাহলে তলাটি বেশ পুরু এমন কোন পাত্রে মাখন গালিয়ে মশলা মাখা কপি তার ওপর দিয়ে ঢিমে আঁচে ঢাকা দিয়ে বসিয়ে রাখুন। খানিকক্ষণ পর ঢাকা খুলে উল্টে দিয়ে আবার ঢাকা দিন। কপি নরম হয়ে এলে এবং মশলা গা-মাখা হয়ে গেলে নামিয়ে নিয়ে ডিসে সাবধানে ঢালুন যাতে কপিটি অক্ষত থাকে, উপরে গরম মশলার গুঁড়ো ছড়িয়ে টমাটো চাকা চাকা করে কেটে সাজিয়ে পরিবেশন করুন। পাত্রের পাশে ছুরি রাখবেন, যাতে কেটে কেটে নেওয়া যায়। এটা গেল কায়দার ব্যাপার, ঝামেলাও আছে, খরচও নিতান্ত কম নয়।

এবার দ্বিতীয় প্রণালীর কথা বলি, এটা অনেক সহজসাধ্য। প্রথম প্রণালীর উপকরণ থেকে অনায়াসে টক দই এবং মাখন বাদ দিতে পারেন। মাখনের বদলে চার টেবিলস্পুন তেল এবং এক চায়ের চামচের পরিমাণ ঘি হলেই চলবে। মশলাগুলো আগের মত পিষে রাখুন। কপি বড় বড় কয়েকটা টুকরো করে নিন, প্রয়োজনে পরিমাণ মত আলু ডুমো ডুমো করে কেটে দিতে পারেন, পেঁয়াজটা মশলার সঙ্গে মেশাবেন না, চাকা চাকা করে কাটুন। এবার কপি, আলু ও পেঁয়াজ ঐ বাটা মশলা, তেল, ঘি, কাটা টম্যাটো, দু-তিনটে তেজপাতা ইত্যাদি সামান্য জলের ছিটে দিয়ে মেখে ঢাকা পাত্রে ঢিমে আঁচে বসিয়ে দিন। খানিকক্ষণ পর পর ঝাঁকিয়ে নেবেন, না হলে খুন্তি দিয়ে নেড়েও দিতে পারেন, তবে টুকরো কপিগুলো যেন ভেঙে বা থেঁতলে না যায়। জল মরে গেলে গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে রাখুন। প্রেসার কুকারে দেবেন না কিন্তু, তাহলে কপির ঘণ্ট হয়ে যাবে।

সিম ভাপানো

উপকরণ—কাঁচ সিম ২৫০ গ্রাম, ফুলবড়ি ২৫ গ্রাম, কাঁচা লংকা, নুন পরিমাণমত, সর্ষের তেল বড় চামচে অর্থাৎ টেবলস্পুনের মাপে তিন চামচ, আন্দাজ মত পোস্ত (২০ গ্রাম আনুমানিক) বাটা, ধনেপাতা কুঁচি, চায়ের চামচের সিকি চামচেরও কম চিনি।

প্রণালী—সিমের দুপাশের আঁশ ছাড়িয়ে দু-টুকরো করে কেটে ধুয়ে নিন। এবার বড় একটা চ্যাপটা গঠনের পাত্রে (প্রেসার কুকারের বাটি) সিম, পোস্ত বাটা, কাঁচা লংকা চেরা, ধনেপাতা কুচি, বড়ি, তেল, নুন, চিনি সব একসঙ্গে মেখে ভাপে সিদ্ধ করুন—(প্রেসার কুকারে স্টিম উঠে সোঁ সোঁ আওয়াজ শুরু হওয়া মাত্র নামিয়ে নেবেন)।

এগ পকোড়া

উপকরণ—ডিম ২টি, বড় চামচের চার চামচ ময়দা, বেকিং পাউডার সিকি চামচ (চায়ের চামচের), পরিমাণ মত নুন, ভাজবার জন্য ডালডা কিংবা বাদাম তেল।

প্রণালী—ময়দাটা আধ চামচ ডালডা বা তেল ময়ান দিয়ে ঠেসে নিন, বেকিং পাউডারও তখনই দেবেন, জল দেবেন না। ময়ান দেওয়া ময়দায় ডিম দুটি ভেঙে দিন, খুব ফেটাতে থাকুন, যত হাল্কা হবে গোলা, পকোড়া তত মুচমুচে হবে। ডালডা বা ছাঁকা তেলে গাঢ় বাদামী রং ধরা পর্যন্ত ছোট ছোট পকোড়া আকারে ভেজে তুলুন, এবার গরম গরম পরিবেশন করুন টম্যাটো ও চিলি সস সহযোগে।

এবারে শেষ করব এগ স্যানডুইচের একটি রকমফের দিয়ে।

উপকরণ—পাঁউরুটি (স্লাইসড ব্রেড) টাটকা হওয়া চাই চারশো গ্রাম, মাখন, ডালডা বড় চামচের ২ চামচ, পরিমাণমত নুন, মাঝারি পেঁয়াজ ২টি, মাঝারি ডিম ২টি, অল্প শসা কুচো, টম্যাটো কুচো।

প্রণালী—পাঁউরুটির ধার কেটে অর্ধেকগুলিতে মাখন মাখিয়ে রাখুন (১২ টুকরোর ৬ টুকরো), বাকিগুলো এমনি রাখুন। কড়াতে ডালডা দিন, খুব গরম হলে পেঁয়াজকুচি, নুন, টম্যাটো ও শশাকুচি আগে দিয়ে পরে ডিম ২টি ভেঙে দিয়ে নাড়তে নাড়তে নামিয়ে নিন, জিনিসটা লেই লেই হবে। এবার শুকনো পাঁউরুটিতে এই লেইটা পুরু করে লাগিয়ে মাখন লাগানো পাঁউরুটি উপরে দিয়ে চেপে ধরুন। পরে কোণাকুণিভাবে এই জোড়া পাঁউরুটি কেটে স্যানডুইচের আকৃতি দিন। পিকনিকে সঙ্গে নেবার পক্ষে খুব ভাল।

বারান্তরে কিছু চীনে রান্না দেবার ইচ্ছে রইল। ☐

মনোশ্রী লাহিড়ী

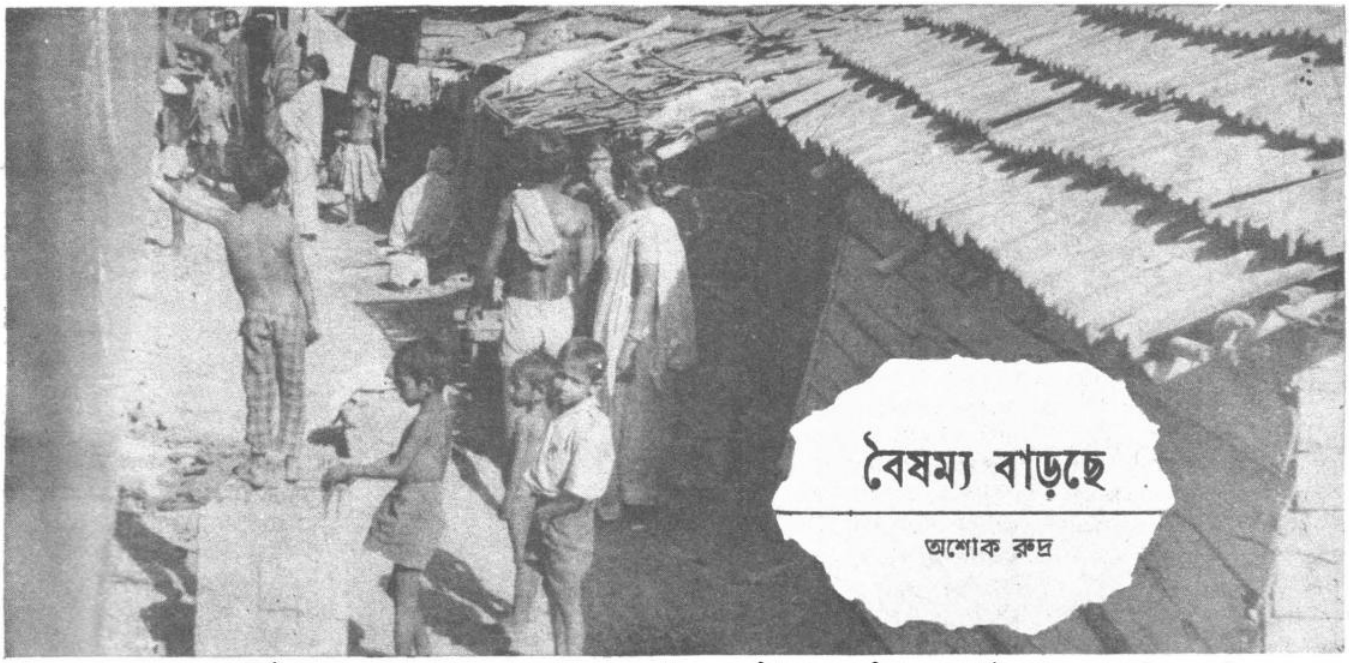

বৈষম্য বাড়ছে

অশোক রুদ্র

আলোকচিত্র : উৎপল ভট্টাচার্য

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল বণ্টন বৈষম্য কমান। কিন্তু কমা দূরে থাক, বৈষম্য বেড়েই চলেছে। অনেক সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে এই কথাটা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করব না। যা চোখে দেখা যায় সেইরকম কয়েকটি বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

প্রায় দশ বছর যাবৎ মূল্যস্ফীতি ঘটেই চলেছে। সেই অবস্থায়, বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থানে স্থিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের জীবন মান বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। যাদের আয় টাকার হিসাবে অপরিবর্তিত থাকে, মূল্যবৃদ্ধির ফলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়, তাদের অবস্থার অবনতি ঘটে। অপর দিকে ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেরই ক্ষেত্রে যা ঘটে তা মূল্য যে হারে বাড়ে, অর্থাগম তার চেয়ে অধিকতর হারে বেড়ে চলে। ফলে তাদের জীবন মান আরও উন্নত হয়। আর যে সব চাকুরেরা এমন ডিয়ারনেস এলাউনস পায় যাকে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে রেখে বাড়ান হয়। তাঁদের ক্রয় ক্ষমতা অপরিবর্তিত থেকে যায়। এই তিনরকম ঘটনাই ঘটছে।

আমাদের দেশের দরিদ্রতম মানুষ তারা যাদের অর্থ উপায়ের কোন পথই নেই, যারা ভিক্ষা করে কুড়িয়ে বাড়িয়ে কুকুর বিড়ালের মত জীবন ধারণ করে। ভিখিরি কাঙালী এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা যারা বড় বড় শহরগুলিতে জঞ্জালের সঙ্গে মিলেমিশে জঞ্জালের মতই জীবন ধারণ করে, তারা সংখ্যায় একেবারেই নগণ্য নয়। বরং দিনকে দিন এদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এদের জীবন মানের উন্নতির কোন প্রশ্নই ওঠে না। যারা কিছু একটা করে আয় করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে দুঃস্থ যে সব মজুরেরা তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল ক্ষেত-মজুরেরা। ১৯৭১ সালে এদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫ কোটি। এই ক্ষেতমজুরদের জীবন মান উত্তরোত্তরই খারাপ হয়ে চলেছে। এরা সংগঠিত নয়। এদের কোন ট্রেড ইউনিয়ন নেই। এদের হয়ে লড়াই করে না কোন রাজনৈতিক পার্টি। ১৯৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিম্নতম খেতমজুরির হার বেঁধে দিয়েছিল ৮.১০ টাকা। কিন্তু ১৯৮২ সালেও পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ গ্রামে ক্ষেতমজুরদের মজুরির হার থেকে গিয়েছিল তার থেকে অনেক নিচে। কিন্তু এই কয় বছরে প্রয়োজনীয় মূল্যের মান বৃদ্ধি পেয়েছিল মোটামুটি শতকরা ৪০ ভাগ। এই সময়কালে ক্ষেতমজুরদের মজুরির হার যে একেবারেই বৃদ্ধি পায়নি তা বলা যায় না। অনেক জায়গায় বেড়েছে। কিন্তু সব মিলে ক্ষেতমজুরদের জীবন মান যে অবনতই হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কৃষি ছেড়ে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আসা যাক। এই সব ক্ষেত্রে নিযুক্ত মজুরদের সংখ্যা ১৯৭১ সালে ছিল ৩½ কোটি আর তার মধ্যে মাত্র ৫০ লাখ ছিল কারখানার শ্রমিক। কারখানার বাইরে কাজ করে যে শ্রমিকরা তাদের অবস্থাও অনেকদূর পর্যন্ত ক্ষেতমজুরদের মতই। অর্থাৎ তারা সংগঠিত নয়। তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নেই কোন আইন। চাপ দিয়ে মজুরি বাড়ানোর সম্ভাবনা তাদের ক্ষেত্রে অতিশয় কম। এরা মোট বয়, ঠেলাগাড়ি ঠেলে, রিকসা টানে, জুতো সেলাই করে, দোকানে কর্মচারীর কাজ করে। উৎপাদনের কাজ করে এমন ক্ষুদ্র সংস্থায় যা কারখানার আইনের বাইরে পড়ে। এই সব শ্রমিকদেরও জীবন মান নেমেই চলেছে। কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা তুলনায় ভাল এই অর্থে যে মাঝে মাঝেই তারা ধর্মঘট করে মজুরি বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। চেষ্টা করলেই সাফল্য অর্জিত হয় তা অবশ্য না। অনেক কারখানায় ধর্মঘট হয় না, অনেক ধর্মঘট সফল হয় না। সুতরাং সংগঠিত আন্দোলনের মারফত কারখানার শ্রমিকদের জীবন মানের ক্ষয় কোন কোন ক্ষেত্রে রোধ করা সম্ভব হয়, এর বেশি কিছু বলা যায় না। ভারতবর্ষ দেশটা শিল্পের ক্ষেত্রে যে কতটা অনুন্নত তার একটি প্রমাণ যে কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা যখন ছিল ৫০ লাখ সেই ৭১ সালে সরকারি কর্মচারীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১½ কোটি। এই কর্মচারীদের এক বৃহৎ অংশ গত কয়েক বছর এক বিশেষ সুবিধা ভোগ করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরেদের এবং তার অনুকরণে কোন কোন রাজ্য সরকারের চাকুরেদের বেতনের অন্তর্ভুক্ত ডিয়ারনেস এলাউনসকে মূল্যসূচীর উপর এমনভাবে নির্ভর করান হয়েছে যে যেমন যেমন মূল্য বাড়ছে তার সমান অনুপাতে ঐ ভাতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এই সরকারি কর্মচারীদের আর্থিক আয় বেড়েই চলেছে। এদের জীবন মানের কোন ক্ষয় ঘটছে না। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এক খুব বড় অংশই সরকারি কর্মচারী।

এইসব মিলে বণ্টন বৈষম্যের চেহারা নিচ্ছে এই প্রকার। বৃহৎ পুঁজিপতিদের আয় ও সম্পদ বাড়ছে, তেমনি আয় বাড়ছে জোতদার শ্রেণীর কৃষকদের। মধ্যবিত্তের এক বড় অংশের জীবন মান অপরিবর্তিত থাকছে। কারখানার শ্রমিকদের জীবন মান কমছে। কারখানার বাইরে মুটে-মজুরদের ও ক্ষেতমজুরদের জীবন মান আরও অনেক বেশি পরিমাণে কমছে।

বৈষম্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভিতরেও খুব বেশি পরিমাণে বাড়ছে। সকলেরই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকছে না। মধ্য বিত্তের কোন কোন অংশের আয় খুব বেশি বাড়ছে। আবার কোন কোন অংশে অত্যধিক অর্থ কষ্ট ভোগ করছে। কেন কিভাবে এই বিপরীত গতি সঞ্চারিত হচ্ছে তার আলোচনা করার আগে ঘটনাটা কেন গুরুত্বপূর্ণ তা বলে নিই। আমাদের দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিরা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে। আমলাতন্ত্রের সদস্যরা সবই এই শ্রেণীভুক্ত। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক পার্টি—তা যে মত ও শ্রেণী স্বার্থের ধারকই হক না কেন—তার নেতা ও ক্যাডারদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণী-ভুক্ত। তার ফলে রাষ্ট্র পরিচালনায় পার্টিদের দ্বারা রাজনৈতিক পরিচালনা এমনভাবে করা হয় যে মধ্যবিত্তের স্বার্থ সাধিত হয় বা সংরক্ষিত হয়। অর্থনীতিতে বণ্টন বৈষম্য যদি তীব্রতা প্রাপ্ত হয় তো তার প্রতিবিধানকল্পে কিছুই করা হবে না যদি তার দ্বারা মধ্যবিত্তের একাংশ লাভবান হয়। এই ঘটনাটাই আমাদের চোখের সামনে ঘটছে।

মধ্যবিত্তের ভিতরে বণ্টন বৈষম্য বৃদ্ধি পাওয়ার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যাক। আমাদের দেশের আয়কর নীতির মধ্যে একটা মজার জিনিস আছে। একই পরিবারভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিরা তাদের ভোগের জন্য ব্যয় করে মিলিত ভাবে। এই মিলিত ব্যয়ের উপর নির্ভর করে পরিবারের জীবন-

জ্ঞান। কিন্তু আয়কর বসানোর সময় বিভিন্ন ব্যক্তির আয়গুলিকে স্বতন্ত্রভাবে হিসাব করা হয়। ধরা যাক এক পরিবারে তিন ভাই আয় করে গড়ে মাসে হাজার টাকা করে। তাদের মিলিত তিন হাজার টাকার আয়ের থেকে এক পয়সাও কর কাটা হবে না। কারণ মাসিক হাজার টাকা আয়ের উপর কোন করই ধার্য হয় না। কিন্তু ওই তিন ভাইয়ের জায়গায় যদি একজন ভাই তিন হাজার টাকা আয় করে আর দুইজন যদি হয় তার আশ্রিত তো সেই তিন হাজার টাকা থেকে বেশ এক মোটা অংক (প্রায় ৬৫০ টাকা) কর হিসাবে কাটা যাবে।

এবার নেওয়া যাক মেয়েদের মধ্যে চাকরি করার রেওয়াজ বাড়ার ঘটনাকে। এমন অনেক পরিবার রয়েছে যা একজন মাত্র পুরুষের আয়ের উপর নির্ভরশীল একাধিক পুত্রকন্যা, ভাইবোন, বাবা-মা ওই একজন মাত্র ব্যক্তির আয়ে ভাগ বসায়। এই রকম একজন ব্যক্তির যদি মাসিক আয় হয় দেড় হাজার টাকা আর বাড়িতে খাওয়ার লোক যদি হয় ছয় জন, যা এমন কিছুই বেশি নয়, তো সেই পরিবারের লোকেদের গড় আয় হয় মাথাপিছু আড়াইশ টাকা। অপরদিকে ভাবা যাক একটি পরিবারের কথা যার সদস্য সংখ্যা তিন—স্বামী, স্ত্রী ও একটি সন্তান। ধরা যাক এখানেও স্বামীর আয় দেড় হাজার টাকা। স্ত্রী যদি কেরাণীর কাজ করেন তো তিনিও করেন হাজার টাকা মত। দুইজনে মিলে আড়াই হাজার টাকা। এই পরিবারের মাথাপিছু আয় আটশ টাকার বেশি। আমাদের দেশে যদি থাকত আয় সংক্রান্ত এমন নীতি, যার মূল অনুপ্রেরণা সমাজকল্যাণ, তো পরিবারে খাওয়ার লোক কয়জন আছে সেই সংখ্যাটাকে বাদ দিয়ে আয় বিতরণ করা হত না বা কর ধার্য করা হত না। কিন্তু সেই প্রকারে আয়-সংক্রান্ত নীতি আমাদের দেশে নেই। তার ফলে একই ধরনের বিদ্যা-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে জীবন মানে আকাশ-পাতাল তফাৎ লক্ষিত হয়।

মধ্যবিত্ত অর্থনীতিতে এক বিপুল পরিবর্তন এসেছে বিদেশে গিয়ে অর্থ উপায় করার ব্যাপক প্রসারের ফলে। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় পরিবার অর্থের লোভে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে যারা জাতে কুলীন তাদের মক্কা হল প্রথমে ইংল্যানড ও যুক্তরাষ্ট্র, তারপর কানাডা, অসট্রেলিয়া ফ্রানস, জারমানি প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ। এই কৌলীন্য যারা অর্জন করতে পারেনি তারা পাড়ি জমাচ্ছে আফরিকার বিভিন্ন দেশে, মধ্য-প্রাচ্যের আরব দেশগুলিতে। দেশে থেকে যে ব্যক্তি দেড়-দুই হাজার টাকা আয় করত বা সেই ব্যক্তি বিদেশে গিয়ে মাসে পনের বিশ হাজার টাকা আয় করছে, কখনও কখনও বা ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকাও। আফরিকার দেশ-গুলি অনুন্নত। কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ডাক্তার, ইনজিনিয়ার, অধ্যাপক প্রভৃতি তৈরি হচ্ছে না বলে অত্যধিক বেতন দিয়ে বিদেশ থেকে এইসব আমদানি করছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি শিল্পে নিতান্তই পশ্চাদপদ। কিন্তু কপাল জোরে খনিজ তেলের অধিকারী হওয়ার দরুণ এই দেশগুলি অর্থ সম্পদে ইউরোপের দেশগুলির চেয়েও অধিক ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে। শুধু ডাক্তার, ইনজিনিয়ার, অধ্যাপক নয়—সামান্য কারিগরি বিদ্যা-সম্পন্ন ব্যক্তিদেরও প্রচুর চাহিদা এই দেশগুলিতে। ফলে আমাদের দেশ থেকে বিশেষ করে আরব সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি থেকে এক বিশাল সংখ্যক লোক ওই দেশগুলিতে গিয়ে কাজ কারবার করতে শুরু করেছে। এইসব বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা যে প্রভূত অর্থ উপায় করছে তার অনুপ্রবেশ দেশের মধ্যবিত্তের একাংশের মধ্যে অস্বাভাবিক ধনস্ফীতি ঘটাচ্ছে। কোন পরিবারের ছেলে বিদেশ থেকে মাসে মাসে মোটা অঙ্কের টাকা পাঠাচ্ছে। কোন পরিবারের লোকেরা মাসতুতো, পিসতুতো দাদা বৌদির কাছ থেকে নিত্যনতুন উপহার পাচ্ছে। বিদেশি জিনিস বলতেই আমাদের দেশের লোকের জিভে জল গড়ায়। সেইরকম বিদেশি জিনিসের সম্ভারে মধ্যবিত্ত সংসার সজ্জিত হয়ে উঠছে। যে সব পরিবার এইরকম মোটা অঙ্কের টাকাও পাচ্ছে না উপহারও পাচ্ছে না তাদের চোখ টাটাচ্ছে। নিজেদের অবস্থায় তাদের অসন্তোষ বাড়ছে। সব সময় খুঁজছে কিভাবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাল দিয়ে তারাও আরও খানিক কাঁচা টাকা আয় করতে পারে।

মধ্যবিত্তের এক অংশের মধ্যে যে টাকার পরিমাণ বেড়েই চলেছে তার একটি পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিতে। বাজারে সবকিছু অগ্নিমূল্য কথাটা মোটেই ভুল নয়। কিন্তু হাত দেওয়া যায় না' কথাটা ভুল। হাত যদি দেওয়া না যায় তো অগ্নিমূল্যের জিনিসগুলি কিনছে কে? কলকাতার বাজারে মাছের দর ওঠে ৩০ টাকা—৫০ টাকার কথাও শোনা যায়। কিন্তু কোন মাছই তো পড়ে থাকে না। ভাল শাড়ি কিনতে গেলে তিন, চার, পাঁচশ টাকা খরচ করতে হয়। কিন্তু ঐ দামের শাড়ি কেনা কি কমেছে? তাতো মনে হয় না। কলকাতায় নিত্যনতুন গগনচুম্বী অট্টালিকা উঠছে। ফ্ল্যাট বিক্রি হচ্ছে প্রতি বর্গফুট তিনশ টাকা হারে। অর্থাৎ হাজার বর্গফুটের একটি মাঝারি আয়তনের ফ্ল্যাটের মূল্য তিন লাখ টাকা। কারা কিনছে? যারাই কিনুক কোন ফ্ল্যাটই পড়ে থাকছে না। দেশ ভ্রমণের হিড়িক বেড়েই চলেছে। কাগজ পড়লেই বিজ্ঞাপন দেখা যায় প্যাকেজ ট্যুরের—মাদুরাই, কন্যাকুমারী, অজন্তা-ইলোরা, গোয়া, অমরনাথ, কেদারবদ্রী প্রভৃতির স্থান পর্যটন করিয়ে আনার জন্য ট্র্যাভেল এজেনটরা নিচ্ছে মাথাপিছু ন্যূনাধিক দেড়হাজার টাকা মত করে। পাঁচ জনের একটি পরিবারের ভ্রমণের জন্য এজেনটকেই দিতে হয় সাড়ে সাত হাজার টাকা। অন্যান্য খরচ মিলিয়ে তিন সপ্তাহের ভ্রমণের জন্য হাজার দশেক টাকা খরচ করছে যারা তারাও মধ্যবিত্তেরই অন্তর্গত। এই ব্যবসায়েও কোন মন্দা দেখা যাচ্ছে না।

ঘটনাটা তাহলে কী ঘটছে? মধ্যবিত্ত বড়লোক হয়ে যাচ্ছে? তাদের মধ্যে দারিদ্র্য লোপ পাচ্ছে? তা যদি সত্য হত তো আক্ষেপের কারণ থাকত না। কিন্তু আসল ঘটনা হল—বৈষম্যবৃদ্ধি। কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ। □

খেলার আসর

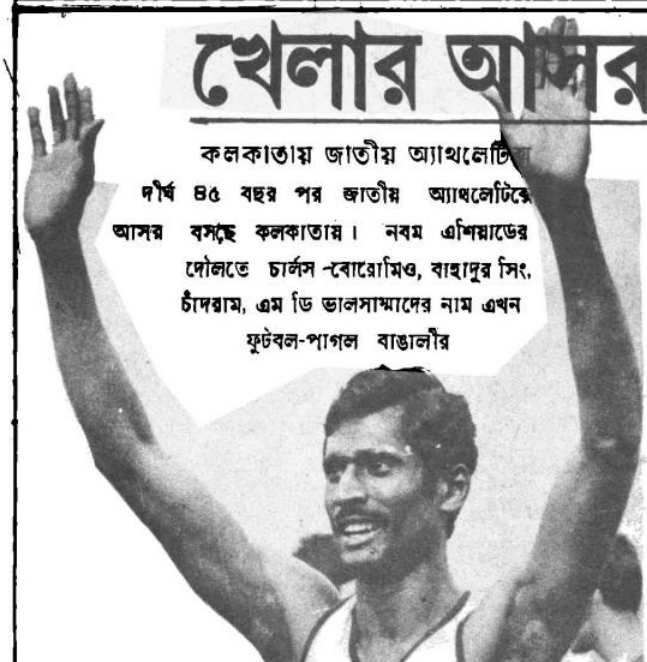

কলকাতায় জাতীয় অ্যাথলেটিক্স

দীর্ঘ ৪৫ বছর পর জাতীয় অ্যাথলেটিক্সের আসর বসছে কলকাতায়। নবম এশিয়াডের দৌলতে চার্লস বোরোমিও, বাহাদুর সিং, চাঁদরাম, এম ডি ভালসাম্মাদের নাম এখন ফুটবল-পাগল বাঙালীর ঘরে ঘরে। ওদের চাক্ষুস করার সুযোগ অনেকেই হাতছাড়া করতে চান না। সঙ্গে প্রত্যাশা এশিয়াডের হিরোরা নতুন রেকর্ড গড়বেন। কেমন হবে কলকাতা ন্যাশনাল -- তার পর্যালোচনা। এছাড়া রাজ্য অ্যাথলেটিক্সের রিপোর্ট।

২৮ জানুয়ারি সংখ্যায়

টেস্ট ম্যাচ

হায়দ্রাবাদে জাভেদ মিয়াঁদাদ-মুদাস্সর নজর জুটি বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন। ইমরান খান ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের নাস্তানাবুদ করলেন। রাজন বালার রিপোর্ট, সঙ্গে অগ্নিয় তরফদারের ছবি।

অন্যান্য

কলকাতা ফুটবলের দলবদল শুরু হতে দেড় মাসের বেশি সময় বাকি, কিন্তু ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে স্টারদের নিয়ে টানাটানি, রাজনীতি, জল্পনা-কল্পনা। সেইসব নেপথ্য কাহিনী। সন্তোষ ট্রফির খবর। স্মৃতিচারণে হরেন কাবাসী। 'আমি যদি পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী হতাম' পর্যায়ে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী। টাকায় প্রথম হ্যাণ্ডবল লিগ। কল্যাণ মুখার্জির 'খেলাধূলা ও বিজ্ঞান'। নিয়মিত বিভাগ এবং আরও কিছু বাড়তি আকর্ষণ।

পদাতিকের নৃত্যোৎসব

'যক্ষগণ' ... । আলোকচিত্র : প্রদীপ সাহা

অমিতা দত্ত

পদাতিক ও আন্তর্জাতিক নাট্য সেমিনার আয়োজিত সাতদিনব্যাপী নৃত্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২ থেকে ৮ জানুয়ারি কলামন্দিরে। ভারতীয় প্রধান মার্গীয় নৃত্যধারাগুলির—ভরতনাটম্, কত্থক, মণিপুরী, ওড়িশি ও কথাকলি—অতিরিক্ত প্রদর্শিত হয় কর্ণাটকের যক্ষগণ এবং পুরুলিয়ার ছৌ।

২ জানুয়ারি কথাকলি দিয়ে নৃত্যোৎসবের উদ্বোধন হয়। কেরালা কলামণ্ডলম সুবিখ্যাত সংস্থা এবং সেদিনের 'দুঃশাসন-বধ' নৃত্যাঞ্জলিটি নিঃসন্দেহে তাদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। কল্যমণ্ডলম গোষ্ঠীর রৌদ্রভীমের মধ্যে একই সঙ্গে দেখা দিয়েছিল রুদ্র, বীর ও বীভৎস রসের সংমিশ্রণ। কলামণ্ডলম রমনকুট্টি নায়ারের দুর্যোধন-চরিত্র চিত্রণও ছিল প্রশংসনীয়। অন্যান্য চরিত্রগুলিও খুব প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় ছিল। কথাকলি নৃত্যনাট্যে স্বাভাবিকভাবেই কিছু অতিনাটকীয়তা দেখা যায়। সেদিনের রঙ্গমঞ্চে তাই ছিল রক্তারক্তি এবং বীভৎস রসের বাড়াবাড়ি। এগুলি কত্থকে বা ভরতনাট্যমে দৃষ্টিকটু হলেও কথাকলির মধ্যে মানানসই।

৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় যক্ষমণ্ডলের 'বালী বধে চূড়ামণি' প্রসঙ্গ। এই প্রথম কলকাতায় দর্শকগণ কর্ণাটকের সুপ্রসিদ্ধ লোকনাট্য যক্ষগণ দেখার সুযোগ পান। রামায়ণ থেকে নেওয়া গল্পটি অন্ধ্রের কবি পার্তি সুব্বার শ্লোকের উপরে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছিল। নৃত্যনাট্যটি ছিল সজীব, প্রাণবন্ত এবং দৃষ্টিনন্দন। সুন্দর বেশভূষা এবং অন্তরহসঙ্গীত নাটকটিকে আরও মধুর করে তুলেছিল।

তৃতীয় দিনের আকর্ষণ ছিল ভরত-নাট্যম—মৃণালিনী সারাভাই নির্দেশিত নৃত্যনাট্য সেরাভেন্দ্র ভূপাল কুরুভঞ্জি এবং সোনাল মানসিংহের একক নৃত্য।

সংযুক্তা পাণিগ্রাহী। আলোকচিত্র : প্রদীপ সাহা

মৃণালিনী সারাভাই কেবল যে নিজে নৃত্যজগতে এক অবিস্মরণীয় নাম তা নয়, তাঁর আমেদাবাদের সংস্থা দর্পণাও এখন সুবিখ্যাত। বহু পুরান নৃত্যনাট্যটি তিনি নতুন করে সাজিয়ে সেদিন তাঁর দর্পণার মেয়েদের দিয়ে প্রদর্শিত করলেন। যৌথ নৃত্যগুলির মধ্যে লক্ষণীয় নৃত্যগতিগুলির সুষমা ও সামঞ্জস্য। কুরুভঞ্জির চরিত্রে মল্লিকা সারাভাইয়ের নৃত্যও ছিল প্রশংসনীয়। তাঁর সহজাত নৃত্যপ্রতিভা ও লাবণ্য একই সঙ্গে দর্শকদের আকর্ষণ করেছিল।

সোনাল মানসিংহের নৃত্য সেদিন ছিল প্রাণবন্ত ও দৃষ্টিনন্দন। সুদর্শনা সোনাল অভিনয় এবং নৃত্য দুয়েতেই আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। জয়দেবের অষ্টপদী 'প্রিয় কমলাকুচ মণ্ডল'কে বন্দনারূপে ব্যবহার আমরা অন্য নৃত্যধারায়ও দেখতে পাই। কিন্তু এই অষ্টপদীটি বর্ণমের রূপে নিবেদন করে সোনাল নতুনত্ব দেখালেন। তুলসীদাসের রামায়ণ থেকে 'সীতাস্বয়ম্বর' উপাখ্যানটিও সোনাল দক্ষতার সঙ্গে পেশ করলেন।

ওড়িশি সন্ধ্যার মূল আকর্ষণ ছিল সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর একক ওড়িশি নৃত্য এবং তাঁর গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের অভিনয়। সংযুক্তা নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের গৌরব। যেমন মার্জিত তাঁর অভিনয় তেমনই সুষম সুন্দর তাঁর নৃত্য। পল্লবীর নৃত্যেই হক আর অর্ধনারীশ্বরের অভি-নয়েই হক, তিনি এক কথায় নিরুপম। তাঁর স্বামী রঘুনাথ পাণিগ্রাহীর কণ্ঠসঙ্গীত এবং কেলুচরণ মহাপাত্রের পাখোয়াজ তাঁর নৃত্যগুণ আরও অকর্ষক করেছিল।

কেলুবাবু পরিকল্পিত – 'গীত-গোবিন্দ'ও সেদিন প্রদর্শিত হয়েছিল। যৌথ নৃত্যপরিকল্পনা যে কত সাবলীল ও সুন্দর হতে পারে তা কেলুবাবুর মত শিল্পী প্রতিভারই প্রদর্শন করা সম্ভব। মূল চরিত্রগুলি যেমন সুন্দর করণগুলি ব্যবহার করছিলেন, তেমনই সুন্দর দেহভঙ্গিমায় অভিনয় করছিলেন অন্য নর্তকীরা ব্যাকগ্রাউনডে।

কেলুবাবুর তুলসীদাসের রামায়ণ থেকে 'কৈব প্রসঙ্গ' সেদিন ওড়িশি নৃত্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় প্রদর্শিত হয় পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য। প্রথমে দেখা যায় বিহারের জমদি খুব ছৌ নৃত্য প্রতিষ্ঠানের 'মহিষাসুরমর্দিনী' ও 'অভি-মন্যুবধ'। দুটি প্রসঙ্গই বাঙালি মনকে সহজে নাড়া দেয়। তাই সেদিন কলা-মন্দিরের প্রেক্ষাগৃহ জমজমাট হয়ে উঠেছিল এই লোকনৃত্যের আবেদনে।

মণিপুরী নাচ। আলোকচিত্র : প্রদীপ সাহা

সিংহবাহিনী দুর্গার অসুরের সঙ্গে লড়াই, তাঁর বীরদর্পে দাপটী নৃত্য গৌরবান্বিত করল দর্শককে, আবার তেমনই কিশোর অভিমন্যুর চক্রব্যূহে প্রাণত্যাগ করুণ রসের সৃষ্টি করল।

ওড়িশার মযূরভঞ্জী ছৌ নাচে নাট্যগুণের চেয়ে নৃত্যগুণের প্রাধান্য ছিল বেশি।

গুরু কেদারনাথ সাহুর মুখোশযুক্ত সেরাইকেল-এর ছৌ নাচ সেদিন সুন্দর ব্যঞ্জনা ও নৃত্যকাব্যের মধুর রস সৃষ্টি করেছিল।

মণিপুরী সন্ধ্যায় নৃত্য প্রদর্শন করলেন গুরু বিপিন সিংহ, কলাবতী দেবী, দর্শনা জাভেরী ও মণিপুরী নর্তনালয়ের শিষ্যগণ। মণিপুরী নৃত্য ধারার নানানরূপ তারা একে একে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। মহারাসে চিরাচরিত মানব-ঈশ্বর মিলন সুন্দরভাবে চিত্রিত হল।

মৃদঙ্গচলম এবং তানোম, দুটি নৃত্যই তাণ্ডব রসের। রামলীলায় লীলায়িত মধুর লাস্য নৃত্যের সঙ্গে পার্থক্য বজায় রেখে এগুলি মণিপুরী নৃত্যের বৈচিত্রময় ধারাগুলি তুলে ধরতে সাহায্য করেছিল। কলাবতী দেবীর 'যাহী মাধব, যাহী কেশব' অষ্টপদীটি সেদিন অভিনয়ের দিক থেকে অবিস্মরণীয়।

নৃত্যোৎসবের শেষ দিন ছিল কত্থক-সন্ধ্যা। নৃত্যগুরু বিরজু মহারাজ সেদিনের প্রধান আকর্ষণ। কৃষ্ণবন্দনা দিয়ে শুরু করে তিনি ত্রিতালে নৃত্য দেখালেন। হালকা তেহাই দিয়ে আরম্ভ করলেন এবং একে একে নানা তৎকারের মাধ্যমে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'তকিট তকিট ধিনায়' গিয়ে পৌঁছলেন। সওয়াল জবাবটিও হয়েছিল সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত। গৎনিকাসে স্মরণীয় রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ এবং বর্ষায় ময়ূরের আনন্দ নৃত্য। গৎভাবে দেখালেন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। তাঁর পুত্র জয়কিষেণ এবং শম্ভু মহারাজজীর পুত্র রামমোহন যুগল নৃত্যে প্রদর্শন করলেন গীতোপদেশ। গীতার শ্লোকের মাঝে মাঝে রথের গভীর ব্যঞ্জনা এবং সুন্দর আহার্যের ব্যবহারে দৃশ্যটি সজীব হয়ে উঠেছিল। শাশ্বতী সেন দেখালেন অষ্টমঙ্গলা তালে নৃত্য। তালের গতি অক্ষুণ্ন রেখে তিনি নানারকম লয়কারী তেহাই, টুকরা এবং তোড়া প্রদর্শন করলেন। বিরজু মহারাজ পরিকল্পিত 'দরবারী সেলাম' দেখালেন তাঁর পুত্র জয়কিষেণ এবং দুই শিষ্যা—দুর্গা ও ভেরনিকা। নৃত্যগুণে এই নিবেদনটি জমজমাট হয়ে উঠেছিল। সেদিন সন্ধ্যায় প্রথম নৃত্যশিল্পী ছিলেন পদাতিকের ডিরেক্টার চেতন জালান। □

সুরের সাগর— সাগর সেন

সাগরদার সম্পর্কে আজ এই একটি কথাই বার বার মনে পড়ছে—জীবনের বিপর্যয় আসে ঠিকই, কিন্তু আজ সাগরদা নিজের জীবন দিয়ে তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, অনমনীয়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে জয়টিকা পরে চলে গেলেন। ভাগ্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন না—যতদিন প্রাণ ছিল ততদিন গান ছিল। মৃত্যু তাঁকে কেড়ে নিতে কি পেরেছে? পরাস্ত করতে বা কণ্ঠরোধ করতে পারল? আজও যে তাঁর ছবি দেখি, কথা ও সুর শুনি! রেখে গেলেন অনেক কিছু স্মৃতি, ভালবাসা, মানবিকতা, গান, অসংখ্য গুণগ্রাহী ভক্তবৃন্দ।

সর্বোত্তম মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিলেন সাগর সেন। নিজের মধ্যেই নিজের পূর্ণতা যার বিকাশের জন্য চাই কঠোর মনোবল এবং পরিশ্রম—তাকেই হাতিয়ার করে আজ সাগর সেন পৌঁছেছিলেন সম্মানের শীর্ষস্থানে। তাঁর এই পরিণতির জন্য যতই আমাদের চোখ জলে ভরে যাক না কেন আমরা গর্ব অনুভব করি তাঁর জীবনাদর্শের কথা ভেবে। সদালাপী, শিষ্টাচারী, মিষ্টভাষী এইরূপ বহুগুণে সমন্বিত মানুষটি আজ লাভ করেছেন অমরত্ব।

তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। রেকর্ডও করেছিলেন—'এই জীবন এমনি করে', 'কি হল চাঁদ কেন' ইত্যাদি। তাঁর কণ্ঠে ছিল অপূর্ব দরদ, সুরের মূর্ছনায় আলোড়ন তুলেছিলেন মানুষের মনে। মর্মস্পর্শী কণ্ঠ দিয়ে আমাদের সকলের অন্তঃকরণকে জয় করেছেন। কাছের মানুষ হবার সাধ জাগিয়েছে। দৈহিক যন্ত্রণাকে এককোণে ঠেলে রেখে মানুষকে যে গান শুনিয়ে গেলেন তা অবিস্মরণীয় হয়ে রইবে।

ছোটবড় ভেদ ছিল না তাঁর কাছে। সবাইকে সমান মর্যাদা দেওয়ার এক মহৎ গুণ ছিল তাঁর। তাই তাঁর এই অকালমৃত্যুতে সকল শিল্পীর মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। তাঁর সান্নিধ্যে অনেকেই উপকৃত হয়েছেন।

বিদেশে গিয়ে গান গেয়ে এলেন সাগরদা আজ থেকে প্রায় বছর দশেক আগে। ফিরে এলে তাঁকে দেওয়া হয় এক সম্বর্ধনা। বহু বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণী সম্মিলিত সেই অনুষ্ঠানে, কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে, সাগরদা নিজে সুন্দর একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। ঘরোয়া দুচারটি কথায় বলেছিলেন কিছু ভ্রমণতথ্য। কথা দিয়ে গান দিয়ে সেই সন্ধ্যাটি এক মনোরম পরিবেশে পরিণত হয়।

সাগরদার গাওয়া বহু রেকর্ড জনসমাদৃত হয়েছে—দেশে বিদেশে লাভ করেছে চূড়ান্ত জনপ্রিয়তা—কিছু কিছু গান সাগরদাকে দিয়েছে বিশেষ সুখ্যাতি যেমন, 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান' 'ওগো জলের রাণী,' 'ওহে জীবন বল্লভ,' 'যদি ঝড়ের মেঘের মত' 'একি সত্য সকলি সত্য'। আধুনিক গানের সুরকার হিসেবেও

বিদেশ থেকে প্রত্যাগত সাগরদাকে যে গান শুনিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল, আজও আবার সেই গান গাই, মনে মনে বলি—'কাছে ছিলে, দূরে গেলে, দূর হতে এসো কাছে।' জানি না কোন্ পরদেশে চলে গেছেন সাগরদা। □

ছন্দা দাশগুপ্ত

আলোকচিত্র : বরুণকান্তি চট্টোপাধ্যায়

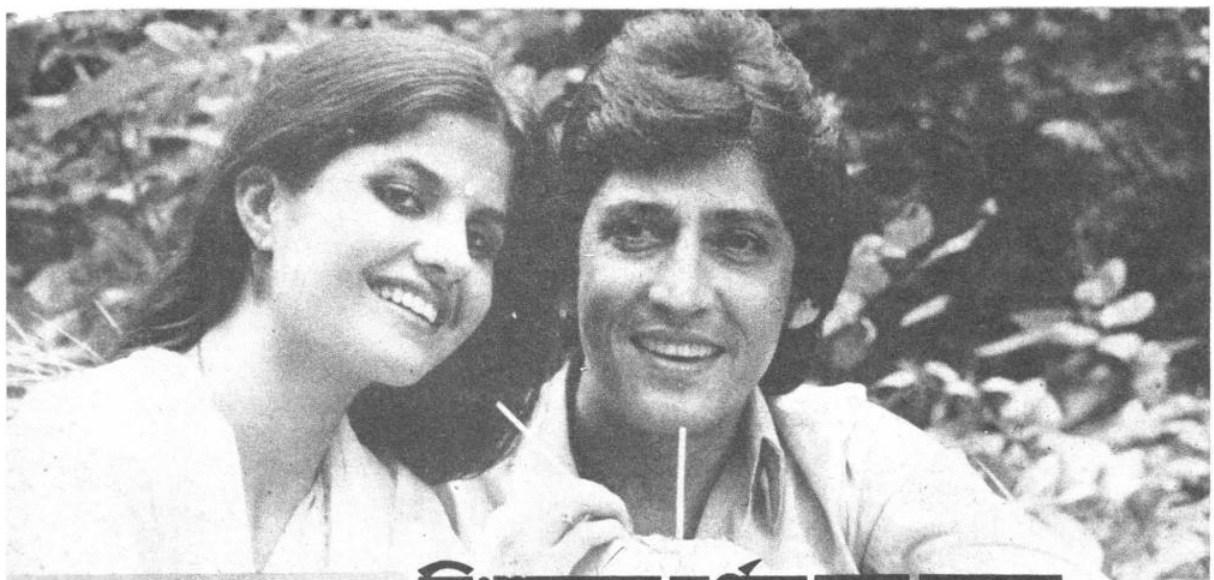

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন...
দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন।

প্রতিবার দাঁত মাজার সময়
কোলগেটের নির্ভরযোগ্য
ফরমুলা আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসকে
রাখে তাজা, নির্মল...
দাঁতকে রাখে শক্ত-মজবুত,
সুস্থ-সবল।

দেখুন কি ভাবে কোলগেট কাজ করে:

দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের সৃষ্টি হয়।

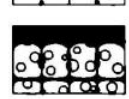

কোলগেটের রাশি-রাশি ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে এই ক্ষয় সৃষ্টিকারী খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দূর করে, দাঁতকে পরিষ্কার, ঝকঝকে রাখে।

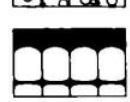

ফলাফল: তাজা, নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস, ক্ষয় থেকে সুরক্ষা আর সুস্থ-সবল দাঁত।

প্রতিবার খাবার পরেই কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে দাঁত মাজতে ভুলবেন না।
নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূরে রাখুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

এর তাজা মিণ্টি স্বাদ... সত্যিই চমৎকার!

এ সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

[জানুয়ারি ২৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ১]

মেষ : শরীর নিয়ে ছোটখাট অশান্তি ; মেয়েদের শরীর চলনসই। আর্থিক ব্যাপারে বিশেষ টানাটানি, ঋণ, কর্মক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত ; মেয়েদের মতের অমিল। পারিবারিক কোন সমস্যা নতুন দিকে মোড় নেবে। মেয়েদের কোন বিষয়ে মত পরিবর্তনে ক্ষতি। ব্যবসায়ীদের বিশেষ মন্দা।

বৃষ : পায়ে আঘাত লাগতে পারে ; মেয়েদের মেয়েলি রোগ বেশ ভোগাবে। আর্থিক কোন সমস্যার অবসান ; সঞ্চয়। কর্মস্থলে প্রায় প্রতি ব্যাপারেই অশান্তি ; মেয়েদের কিছু উপরি পাওনা। গৃহ-সংক্রান্ত সমস্যায় বিব্রত হতে হবে। অবিবাহিতদের কোন যোগাযোগ ভেঙে যাবে। ব্যবসায়ীদের ঋণ।

মিথুন : কোন ব্যথা / বেদনা পংগু করবে ; মেয়েদের দাঁত সংক্রান্ত ঝামেলা। আর্থিক ব্যাপারে নানান ঝামেলা ; প্রচুর ব্যয়। কর্মস্থলে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করা যাবে ; মেয়েদের কোন সহকর্মীর সঙ্গে বিশেষ মতান্তর। পারিবারিক ব্যাপারে মেয়েদের পরাজয়। কোন ভাই / বোনের দূর যাত্রা। ব্যবসায়ীদের নতুন সমস্যা।

কর্কট : পেট সংক্রান্ত ঝামেলা ; মেয়েদের স্নায়ু সংক্রান্ত রোগ। আর্থিক ব্যাপারে অগ্রগতি ও লাভ। কর্মস্থলে কোন ব্যাপারে আশাতিরিক্ত লাভ ; মেয়েদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হবার আশংকা। কর্মপ্রার্থীদের কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মলাভের ইঙ্গিত। ব্যবসায়ীদের নতুন বিনিয়োগ।

সিংহ : অজীর্ণ / অম্বল খানিক ভোগাবে ; মেয়েদের রক্তপাতের আশঙ্কা। আর্থিক ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য ; পুরনো কোন যোগাযোগ ফলপ্রসূ হবে। কর্মক্ষেত্রে সপ্তাহভোর নানান ঝঞ্ঝাট ; মেয়েদের কোন কৌশল ব্যর্থ হবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা। ব্যবসায়ীদের সুসময়।

কন্যা : মানসিক অবসাদ কাহিল করবে ; মেয়েদের ভাল / মন্দয় মিলিয়ে চলবে শরীর। ব্যয়ের চাপ থাকবে সপ্তাহ জুড়ে। কর্মক্ষেত্রে কোন কোন ব্যাপারে আদর্শ থেকে সরে আসতে হবে ; মেয়েদের প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপারে অল্পের জন্য ব্যর্থতা। ভ্রমণে ক্ষতি। ব্যবসায়ীদের আর্থিক ব্যাপারে নতুন ঝামেলা।

তুলা : শরীর খুব একটা ভাল চলবে না ; মেয়েদের শরীর নিয়ে ছোটখাট অশান্তি। আর্থিক ব্যাপারে অচলাবস্থা ; ঋণ। কর্মক্ষেত্রে অন্যের মতামতের ওপর সিদ্ধান্তে ক্ষতি ; মেয়েদের কোন উন্নতিকে কেন্দ্র করে মনান্তর। স্ত্রীর স্বাস্থ্য বিশেষ উদ্বেগজনক। কোন সন্তানের জন্য পারিবারিক অশান্তি। ব্যবসায়ীদের ক্ষতি।

বৃশ্চিক : পেট সংক্রান্ত গোলমাল চলবে ; মেয়েদের অর্শ জাতীয় রোগ ভোগাবে। আয় বাড়লেও মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় বিব্রত করবে। কর্মক্ষেত্রে কোন সুযোগ হাতছাড়া হবে ; মেয়েদের তৎপরতার অভাবে ক্ষতি। কোন বন্ধুর জন্য বিশেষ উদ্বেগ। ব্যবসায়ীদের না-লাভ না-ক্ষতি।

ধনু : হাড় সংক্রান্ত রোগ নিয়ে অশান্তি ; মেয়েদের শরীরও উৎপাত-সূচক। আয় বাড়বে সামান্যই তবে বেসামাল ব্যয় কাহিল করবে। কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ বদলির আশংকা ; মেয়েদের স্থিতাবস্থা চলবে। পারিবারিক কোন সমস্যায় কোন বন্ধুর বিশেষ সাহায্য। ব্যবসায়ীদের প্রবল মন্দা।

মকর : শরীর মোটামুটি ভাল চলবে ; মেয়েদের শরীর চলনসই। উটকো ব্যয়ের দরুন সঞ্চয়ে হাত পড়বে। কর্মক্ষেত্রে একগুঁয়েমির জন্য কোন সুযোগ হারাতে হবে ; মেয়েদের কর্মস্থলে বিশেষ প্রশংসা ও লাভ। পারিবারিক ব্যাপারে মেয়েদের অশান্তি ও ক্ষতি। ব্যবসায়ীদের ক্ষতি।

কুম্ভ : ভাল / মন্দয় মিলিয়ে চলবে শরীর ; মেয়েদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি। আর্থিক ব্যাপারে কোন বন্ধুর পরামর্শে বিশেষ লাভ। কর্মক্ষেত্রে কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা ; মেয়েদের কর্মস্থলে সম্মানহানি গৃহাদি কোন সমস্যার সমাধান মেয়েদের বিশেষ আশা পূরণ ব্যবসায়ীদের লাভ।

মীন : শরীর ভাল চলবে না ; মেয়েদের অম্বল / অজীর্ণ ভোগাবে। আর্থিক ব্যাপারে নতুন ইঙ্গিত ; কিছু লাভ। কর্মক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি হঠাৎ ব্যাহত হবে ; মেয়েদের বচসা, মনান্তর। কোন প্রিয়জন বিয়োগ হতে পারে। জমি-জমা ক্রয় / বিক্রয় সহজে হবে। ব্যবসায়ীদের লাভ।

বিনয় আচার্য

শব্দ শৃঙ্খল

শব্দ শৃঙ্খল—৩২

১	২	৩	৪			৫	৬
৭				■	■	৮	
৯		■	১০		১১	■	■
■		■		■	১২	১৩	১৪
১৫	■	১৬		১৭	■	১৮	
	■		■	১৯	২০		
২১	২২		২৩	■		■	
২৪							

সূত্র : পাশাপাশি

১। অন্ধকার, দুধে আলতা এবং নীলচে রঙ।
৭। মোরগের গর্ত নয়—বিমান চালকের আসন।
৮। অনুনমন।
৯। মিশে যাওয়া বা লুপ্ত হওয়া।
১০। সাধনকারিণী।
১২। মাটির তলার ঝাঁঝালো মূল।
১৫। কৃষ্ণের সখা।
১৮। উল্টে দেখলে ঋষির মাথায় আছে।
১৯। প্রয়োজনে পাবেন।
২১। এটি জ্বললে ব্যবসা শুয়ে পড়ে, গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়।
২৪। মুস্কিল ত্রাতা নারায়ণ।

সূত্র : ওপর-নিচ

১। পাখির কূজন।
২। মহাদেব।
৩। গয়লানী।
৪। ইংরেজ আমলের শাসনকর্তা এখন লোকে তাচ্ছিল্য করে বলে।
৫। এটি টানলে অপমান হয়।
৬। মাঘ মাসে জেঁকে বসে।
১১। গাড়ি।
১৩। কথা ভাষায় 'লুকনো'।
১৪। চোখে চোখে রাখার কাজ।
১৫। বাবুয়ানীতে অভ্যস্তা নারী উল্টে আছেন।
১৬। ভাল খবর এখানে পাবেন।
১৭। সাজিয়ে দেখুন—ফুলের পাপড়ি।
২০। আনন্দ দেওয়া বা রঙ করা।
২২। সোজাভাবে প্রত্যয় না হলে ঘুরিয়ে নিলে মুহূর্ত।
২৩। তিক্ত।

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ১৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়।

সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ৪-২-৮৩। সমাধানপত্রের সঙ্গে প্রকাশিত ছকটি এবং খামের উপর শব্দ শৃঙ্খল-৩২ লিখতে ভুলবেন না।

শব্দ শৃঙ্খল—২৯ সমাধান

বা	রা	ক	পু	র	■	শ	ত
রা	হু	ল	■	বি	হা	র	■
স	■	কা	র	■	খী	■	দা
ত	■	তা	■	লা	র	কা	না
■	শী	■	মা	ল	■	■	পু
রা	ত	■	ভূ	গো	ল	■	র
■	উ	ব	■	লা	ভা	ক	■
কৃ	ষ্ণ	ন	গ	র	■	ট	র

শব্দ শৃঙ্খল ২৯-র জন্য কুড়ি টাকা করে পুরস্কার পাবেন মদনমোহন দাস (৮৮/১ নস্করপাড়া রোড, হাওড়া-৭১১১০৭) ও ধ্রুব চ্যাটারজি (বাঁধনা, হুগলী পিন-৭১২২৪৫)।

১৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত শব্দ শৃঙ্খল (২৯) লটারির বিচারক ছিলেন আশীষ মিত্র।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন : ২৪-৫৫২০), থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২৭-২১৬৯, ২৭-৩৬১৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, ২৬-১৬৭৬ । Telex 021-7896 IPPL IN.

বনমানুষের হাড়

কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস

৪৪

মাঝামাঝি জায়গা থেকে বেরিয়ে এল ডিটারজেনটের বড় প্যাকেট — দু-ভাঁজ করা। চেপেচুপে চ্যাপ্টা করা।

ভেতরে কি যেন রয়েছে।

কেউ লুকিয়ে রেখেছিল — যাতে ক্যানেসতারা উপুড় করলেই ডাসটবিনে গিয়ে পড়ে।

প্যাকেট ছিঁড়ল ইন্দ্রনাথ।

টেপ রেকরডারের রিল — রেকরডিং টেপ।

আধপোড়া টেপ — একপাশ একদম পুড়ে গেছে।

সযত্নে পোড়া টেপের কুচোগুলো তুলে নিল ইন্দ্রনাথ।

খাবার এনেছি গো।

পোড়া টেপ সম্বন্ধে শমিতাকে কোন প্রশ্ন করলনা ইন্দ্রনাথ।

শমিতা, রান্নাঘর থেকে সন্ধ্যেবেলায় কাদের দেখতে ?

মুচকি হাসল শমিতা।

বাবুদের।

তোমার বাবু ?

এ কী প্রশ্ন ?

শমিতা কিন্তু উপভোগ করল অর্থবহ কটাক্ষ। নিক্ষেপ করল পাল্টা কটাক্ষ।

আমি সে মেয়ে নই গো। হাত ঘুরোলেই টাকার কাঁড়ি আনতে পারি। কিন্তু ইজ্জৎ খোয়াবো কেনে ?

পরশুরামের সেই বিখ্যাত উক্তিটা মনে পড়ছে — না মানেই হ্যাঁ।

(চলবে)

PARIBARTAN 26 January 1983 Regn. No. 32815/78 Postal Regn. No. WB/CC—380 Rs. 2.25

রিজেন্ট কিং
এর মুহূর্ত...

রিজেন্ট
কিং
স্বাদ ও সতেজতার সুখী মিশ্রণ

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর
STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

SAA/SM/52A3 BEN